স্বামী গহনানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ
হাওড়া-৭১১২০২

প্রকাশক ঃ
স্বামী আত্মস্থানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ
বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

১৬ই নভেম্বর, ২০০৭
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ঃ ৫ টাকা

মুদ্রক ঃ
সৌমেন ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট
৯/৩, কে. পি. কুমার স্ট্রীট
বালি, হাওড়া-৭১১২০১

স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ
(১৯১৬—২০০৭)

স্বামী গহনানন্দ

একবার কয়েকজন সাধু গাড়ী করে সরিষাস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনে যাচ্ছিলেন। মাঝরাস্তায় গাড়ী বিকল হয়ে পড়ে। সঠিক সময়ে পৌঁছতে পারা নিয়ে সকলেই উদ্বিগ্ন। ঘন্টা দু'তিনের আগে গাড়ী ঠিক হওয়া সম্ভব নয়। একজন সন্ন্যাসী গাড়ী থেকে নেমে কাউকে কিছু না বলে দূরের মাঠ বেয়ে কোথায় যেন এগিয়ে চললেন। গাড়ীটি ঠিক হলে তাঁকে খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল তিনি অনেক দূরে একটি গাছের নিচে বসে নিশ্চিন্ত মনে গ্রামের একদল মানুষের সাথে ভগবৎ প্রসঙ্গ করছেন। প্রায় ঘন্টা দু'য়েক ক্ষুধা, তৃষ্ণা ভুলে তিনি এই মহৎকর্ম করে চলেছেন। এই সন্ন্যাসীই হলেন পরবর্তিকালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের চতুর্দশ অধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

স্বামী গহনানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল নরেশরঞ্জন রায়চৌধুরী। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের দুর্গাপুজোর মহাষ্টমী তিথিতে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার (বর্তমান বাংলাদেশের হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ থানা) বাণিয়াচং-এর অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে তিনি ভরদ্বাজ গোত্রে, দেবরায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মাতা সুখময়ী দেবী। রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরীর চারপুত্র—রাকেশরঞ্জন, সুরেশরঞ্জন, বীরেশরঞ্জন ও নরেশরঞ্জন। ছোটবেলা থেকেই নরেশরঞ্জন গম্ভীর প্রকৃতির, সংযত বাক্, মুখাবয়বে ছিল তাঁর অসীম ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ছাপ। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলি কৈশোরেই নরেশরঞ্জনের চরিত্রে প্রতিভাত হয়েছিল।

ছোটবেলা থেকেই নরেশরঞ্জনের অসামান্য মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বরাবরই বিদ্যালয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছিলেন। অষ্টমশ্রেণী পর্যন্ত কুমিল্লায় এবং দশম শ্রেণী পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জে পড়াশুনো করেন। ছাত্রজীবনেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকাদি অধ্যয়নে তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে দীক্ষিত কয়েকজন সন্ন্যাসীর জীবন তাঁকে খুবই প্রভাবিত করে। তাঁর নিজের খুড়তুতো দুই দাদা কেতকীরঞ্জন (স্বামী প্রভানন্দ) ও প্রমোদরঞ্জন (ব্রহ্মচারী প্রমোদ)-এর নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

কেতকী মহারাজ খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ী দুঃস্থ দরিদ্র অশিক্ষিত নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ ও সেবার যুগ্ম আদর্শের বেদীতলে আত্মবলিদান। কঠোর পরিশ্রমের ফলে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেছিলেন। কেতকী মহারাজ যখন শেলা, চেরাপুঞ্জী ও শিলং আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করে অসুস্থ হয়ে পাহাড়পুর গ্রামে ফিরে আসেন তখন তিনি তাঁর অনেক সেবাশুশ্রূষা করেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি মানব

কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার বাসনা পোষণ করতেন। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কোলকাতার ঠনঠনিয়াতে মেজদার কাছে চলে আসেন। দাদার "স্বদেশী শিল্প ভাণ্ডার" নামক দোকানটি উদ্বোধনের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের হাতে প্রথম ক্যাশমেমোটি তিনিই এগিয়ে দেন। এখানে থাকাকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবর্ষে এ্যালবার্ট হলে আয়োজিত সভায় মিস্ ম্যাকলাউডের বক্তৃতা শোনেন। একই সময়ে মেছুয়াবাজারের এক বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজীর দর্শন লাভ করেন।

সম্ভবতঃ ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দর্শন করেন। তাঁর নিজের স্মৃতিতে ঃ "বিজয়া দশমীতে বেলুড় মঠে গিয়েছিলাম। মন্দির তখনো সম্পূর্ণ হয়নি। বেলুড় মঠ দর্শনের পর আমরা দক্ষিণেশ্বরে যাই। বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বা অন্য কোন সাধুর সাথে পরিচয় ঘটেনি।"

মেজদার ব্যবসার কাজে তিনি একদম মন দিতে পারতেন না। অনবরত নিশির ডাকের মত বিশ্বজগতের আহ্বান—আর্ত, আতুর, দুঃস্থ ও অসুস্থদের দেখলেই তাঁর অন্তরের দহন শুরু হত। দাদা খোঁজ নিয়ে জানলেন ওয়েলিংটন লেনে অদ্বৈত আশ্রমে তিনি প্রায়ই যাতায়াত করছেন। তিনি একদিন নরেশরঞ্জনকে বললেন, "সাধু হতে চাও! সেই রকম সাধু হতে হবে।"

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের স্বামী বামদেবানন্দজীর অনুপ্রেরণায় ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি দাদাকে না জানিয়ে বৌদির অনুমতি নিয়ে ভুবনেশ্বর মঠে যোগদান করেন। হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেলে রাত আড়াইটে নাগাদ ভুবনেশ্বরে পৌঁছান। তাঁর নিজের ভাষায় ঃ "স্টেশনে নেমে দেখলাম চারিদিকে জঙ্গল, স্টেশনে টিম্‌টিম্ করে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। তাতে অন্ধকার যেন আরও বেশি অন্ধকার মনে হচ্ছে।" স্টেশন থেকে গরুর গাড়ীতে ভুবনেশ্বর মঠে পৌঁছলে মঠের অধ্যক্ষ স্বামী নির্বাণানন্দ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

ঐ দিনই সকালে নাপিত এসেছে দেখে তিনি শিখা রেখে মাথা মুণ্ডন করে ফেললেন এবং কচ্ছমুক্ত কাপড় পড়া শুরু করলেন। সেখানে এইসব ঘটনার সাক্ষী ছিলেন শম্ভু বাবু (পরবর্তীকালে স্বামী অকুণ্ঠানন্দ)। সেইদিন থেকেই দু'জনের ভাব জমে যায় যা শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। শম্ভুবাবু পরে বেলুড় মঠে যোগদানের সময় প্রথমদিনই মুণ্ডন ও কচ্ছমুক্ত করতে চাইলে নির্মল মহারাজ (স্বামী মাধবানন্দ) বারণ করেন। শম্ভু মহারাজ কিছুটা অভিমানের সুরে বললেন, "ও তাই নাকি? আমি যে দেখলাম, ভুবনেশ্বরে দু'জন ট্রাস্টির (স্বামী নির্বাণানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দ) সামনে একজন Join করল ; আর এসে না এসেই কচ্ছমুক্ত হয়ে গেল!"

নতুন বেশে নরেশরঞ্জন স্বামী নির্বাণানন্দকে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ, আশীর্বাদ করুন, যেন এই জীবন সুন্দরভাবে কাটাতে পারি।" মহারাজ বললেন, "সব নিজের কাছে। নিজে যদি ঠিক ঠিক করে করতে পার তবেই সেটা হবে।" তাঁর কাছেই তিনি শিখেছিলেন নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং জপ-ধ্যান ও শাস্ত্রপাঠের উপর জোর দিতে। প্রতিটি কাজ ঠাকুর-কেন্দ্রিক, পুঙ্খানুপুঙ্খ কিভাবে করতে হবে তার শিক্ষা স্বামী নির্বাণানন্দ ও স্বামী শঙ্করানন্দের কাছ থেকে তিনি লাভ করেন। তখন থেকেই ভোর রাতে উঠে জপধ্যানের অভ্যাস তৈরী হয়ে গিয়েছিল যা জীবনের শেষদিন অবধি বজায় রেখেছিলেন। সেবক হিসাবে তিনি সূয্যি মহারাজের (স্বামী নির্বাণানন্দ) মন জয় করেছিলেন। স্বামীজীর শিষ্য স্বামী অচলানন্দ (কেদার বাবা) এই সময় ভুবনেশ্বর মঠে কিছু দিনের জন্য এসেছিলেন। ব্রহ্মচারী নরেশরঞ্জন তাঁর পূতসঙ্গ লাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। কেদার বাবা একদিন তাঁকে বলেন, "স্বামীজী বলতেন যখন কারো সেবা করবে, ভাববে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই তার মধ্য থেকে আমার সেবা গ্রহণ করছেন।" এছাড়া নিয়মিত জপধ্যানের ও Diary লেখার অভ্যাস করার কথা তিনি বলতেন।

ভুবনেশ্বরে তিনি দীনেশ পণ্ডিত (শাস্ত্রী) ও পণ্ডিত বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যের কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মহারাজের কথায়, 'উপনিষদ্ পড়তে আমার বরাবর খুব ভাল লাগত। ভুবনেশ্বরে আমাদের সংস্কৃত ও শাস্ত্রাদি পাঠের ব্যবস্থা ছিল। পণ্ডিত মহাশয় আবার পরীক্ষা নিতেন।' শ্রীশ্রীমায়ের কৃপাপ্রাপ্ত স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ দীক্ষাদানের নিমিত্ত ভুবনেশ্বর মঠে আসেন এবং কয়েকজনকে মন্ত্রদীক্ষা দান করেন, যাঁদের মধ্যে নরেশরঞ্জন অন্যতম।

তিনি মঠ-কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ভুবনেশ্বর মঠ থেকে কোলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে চলে আসেন। সময়টি হল ১৯৪২-এর আগস্ট মাস। এর মধ্যে তিনি একবার পুরীতে গিয়েছিলেন। সমুদ্রে স্নানাদি করে জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। অদ্বৈত আশ্রম তখন ছিল কোলকাতার ওয়েলিংটন লেনে। তখন কোলকাতায় স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে। সর্বত্র একটা অস্থিরতা বিরাজ করছে। অদ্বৈত আশ্রমের পরিবেশ ভুবনেশ্বর মঠের পূজা, ধ্যান-জপাদির পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে কোন বাহ্য অনুষ্ঠান নেই। পট রাখা বা পূজা-আরতি কিছুই নেই। আছে উপরতলার একটি ঘরে 'ধ্যানঘর'। অদ্বৈত আশ্রম, সঙ্ঘের একটি প্রকাশন কেন্দ্র হওয়ার সুবাদে কোলকাতার বাইরের শাখাকেন্দ্রগুলিতে কর্মরত অন্য অনেক সাধুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও পরিচয় হতে লাগল। তাঁর কথায় পাই, "প্রকাশনার সুবাদে অদ্বৈত আশ্রমের বিভিন্ন দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ। ফলে একটা আন্তর্জাতিক

দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমি পরিচিত হলাম। রামকৃষ্ণ মিশন, তখনই কী বিশাল তার কর্মপরিধি।" ১৯৪৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তিনি স্বামী বিরজানন্দের নিকট ব্রহ্মচর্য দীক্ষা লাভ করেন। নাম হয় ব্রহ্মচারী অমৃতচৈতন্য।

তাঁর চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় একটি বিশেষ দিক। বিপদের ঝুঁকি নিয়েও কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। এই বিষয়ে তাঁকে একটু Adventure প্রিয় মনে হয়। প্রশাসনের ক্ষেত্রে অনেক সময়েই তিনি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন। দেশ বিভাগের পর যখন কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলেছে, ঐসময় একদিন অদ্বৈত আশ্রমের ছাদ থেকে মহারাজ দেখলেন—নিকটবর্তী একটি বাড়ির ওপরতলায় কয়েকজন মুসলমান বিপন্ন হয়ে রয়েছেন। তাঁরা দূর থেকে আকার-ইঙ্গিতে পূজনীয় মহারাজকে জানালেন—তাঁদের ভাঁড়ার শূন্য। মহারাজ টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়মিত কয়েকদিন তাঁদের খাদ্য সরবরাহ করেছিলেন। পরে তাঁদের পুলিশ উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যায়।

১৯৪৫ সালের নভেম্বরে এক মাসের ছুটিতে তিনি দেওঘর গিয়েছিলেন। দেওঘর থেকে কাশী, কনখল, হৃষিকেশও গিয়েছিলেন। তখন তিনি সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী স্বামী অতুলানন্দ, স্বামী প্রেমেশানন্দ, স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী জগদানন্দ প্রভৃতিদের সঙ্গলাভ করেন। কাশী থেকে তিনি কোলকাতায় ফিরে এলেন। ১৯৪৭ সালে তিনি ছুটিতে মায়াবতী গেলেন। মায়াবতীর মধুর স্মৃতি তাঁর মনে সর্বদা জাগরূক থাকত। "খুব আনন্দের ছিল আমার সেই মায়াবতী-বাস। রাজা মহারাজ বলতেন, 'মায়াবতীতে কর্মী হিসাবে থাকার সুযোগ পাওয়া মানে Prize Posting'। সত্যিই মায়াবতীর কোন তুলনা নেই। পবিত্র তো বটেই। হিমালয়। স্বামীজী সেখানে ছিলেন। ... মায়াবতী তপস্যার স্থান। আমার প্রথম দিকের অভিজ্ঞতায় দেখেছিলাম, রাত দুটো-আড়াইটায় ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। আর ঘুমের দরকার হত না। বিশ্রাম হয়ে যাচ্ছে। তারপর সহজেই জপধ্যান করা যায়। একদিন অন্ধকার রাত, দোতলার বারান্দায় কম্বল জড়িয়ে বসে আছি। এক অপূর্ব দৃশ্য! অন্ধকারে বড় বড় গাছগুলো সব শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শাস্ত্রে আছে, 'বৃক্ষ ইব স্তব্ধঃ।'—বৃক্ষরা যেন স্তব্ধ, ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে।" ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে তিনি কোলকাতায় ফিরে আসেন। সাধকদের জন্যই মায়াবতী—এই কথা আমরা জানতে পারি তাঁর কথা থেকে—"যাঁরা সাধন-ভজনপরায়ণ তাঁরা মায়াবতীতে গেলে খুব উপকৃত হবেন। এরকম পরিবেশ আর কোথায় পাওয়া যাবে?" এরপর সেই বছরের মার্চ মাসের ১২ তারিখে ঠাকুরের তিথিপূজার দিন নিজগুরুর কাছ থেকেই সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করেন। কোলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে তিনি আরও ৪-৫ বছর কর্মী হিসাবে ছিলেন। ১৯৫২ সালের জুন-

এ অদ্বৈত আশ্রম থেকে বাগেরহাট আশ্রমে যান কর্মী হিসাবে। সেখানে তিনি ৬ মাস কাল থাকেন।

তাঁর পরবর্তী কর্মস্থল উত্তরপূর্বাঞ্চলে মেঘালয়ের শিলং আশ্রম। সেখানে তিনি প্রথম যান ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ সপ্তাহে। তখন সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী সৌম্যানন্দ। শিলং-এ পৌঁছানোর কিছুদিন বাদেই শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষে সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী শঙ্করানন্দ, সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দ ও আরও অনেক পূজনীয় সন্ন্যাসিবৃন্দের শিলং আশ্রমে শুভাগমন হয়েছিল। উৎসবের ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত মহারাজ সৌম্যানন্দ মহারাজের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। মহাধুমধামের সঙ্গে মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব পালিত হয়েছিল। এই সময়ে স্বামী গহনানন্দ স্বামী শঙ্করানন্দের নিকট হতে এক মহান শিক্ষা লাভ করেছিলেন। একদিন এক ভক্ত শঙ্করানন্দজীকে বললেন 'আপনি শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।' তখন তিনি ভক্তকে সংশোধন করে বললেন, 'না, তিনি বসবেন বলে আমাকে এখানে আসতে হয়েছে।' শিলং-এ থাকাকালে অধ্যক্ষ স্বামী সৌম্যানন্দের সঙ্গে স্বামী গহনানন্দ প্রায়ই রিলিফের কাজে যেতেন। অনেক গৃহী ভক্ত তাঁকে এই কাজে সহযোগিতা করতেন। খাসিয়াদের মধ্যে দেবীর পূজা খুব প্রচলিত। একবার গহনানন্দ মহারাজ কোন এক গ্রামে দেবীপূজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর মুখে ঈশ্বরকে মাতৃভাবে আরাধনার সুমহান ভাবের ব্যাখ্যা শুনে সরল গ্রামবাসীরা খুবই তৃপ্তি লাভ করেন। তাঁরা পূজনীয় মহারাজকে বলেছিলেন, "আমরা এই প্রথম আপনাদের পেলাম যাঁরা বলছেন, আমরা যে সকল পূজাদি করছি তা ঠিক। এর আগে যারা এসেছে, তাদের মুখে শুনতাম আমাদের এই সকল আচার-অনুষ্ঠান সব ভুল।" মেঘালয়ের এই আদিবাসী মানুষদের প্রতি অনেক আগে থেকেই তাঁর একটা প্রাণের টান ছিল। যখন তিনি কৈশোরে কেতকী মহারাজের সেবায় নিরত ছিলেন, তখন একদিন একদল আদিবাসী কেতকী মহারাজের কাছে এসেছিল। তারা তাঁর সঙ্গ লাভ করে অত্যন্ত ভক্তিভরে 'গুরুকৃপা হি কেবলম্' গাইতে গাইতে বিদায় নিয়েছিল। তাদের সুগভীর শ্রদ্ধা ভক্তি গহনানন্দজীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, 'তাদের (আদিবাসী মানুষদের) তথাকথিত শিক্ষিত, স্বজাতীয় মানুষদের থেকে বেশি আপনার মনে হয়েছিল।' শিলং আশ্রম প্রসঙ্গে মহারাজ পরবর্তী কালে বলেছিলেন, "শিলং-এ আমি মাত্র সাড়ে চার বছর ছিলাম। এর মধ্যে সেখানকার পাহাড়ী জনগণের মধ্যে কাজ করার স্মৃতি এখনও অম্লান রয়েছে। একজন যথার্থ তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানীয় জল দেবার যে আনন্দ ঠিক সেই প্রকার আনন্দ ঐ সকল কাজের মধ্যে পেতাম। মন ভরে যেত।"

স্বামী গহনানন্দের শিলং-এ অবস্থান কালে বেশ কয়েকজন যুবক সাধু হওয়ার জন্য যোগদান করেছিলেন। তাঁদের সকলের প্রতি পূজনীয় মহারাজের একদিকে যেমন ছিল অগাধ স্নেহ অপরদিকে নবাগত যুবকরা যাতে সন্ন্যাস জীবনের ত্যাগ ও সেবাধর্মে অনুপ্রাণিত এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পরম্পরাগত ভাব ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্যক্ পরিচিত হন, তার জন্য তাঁর ছিল মূল্যবান পরামর্শ ও শাসন।

এক যুবক শিলং আশ্রমে যোগদানের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই কঠিন বিকোলাই রোগে আক্রান্ত হন। ১৫ মিনিট অন্তর তাঁকে শৌচে যেতে হত। প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তও নির্গত হত। তীব্র যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। তখন আশ্রমে কোন থাকার ঘর-লাগোয়া শৌচাগার ছিল না । তার জন্য সেই রোগীকে অনেক দূরে শৌচালয়ে যেতে হত। প্রত্যেকবারেই গহনানন্দজী সেই রোগীকে হাত ধরে ধরে শৌচালয়ে নিয়ে যেতেন এবং ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসতেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই যুবক ব্রহ্মচারী রোগমুক্ত হন।

অপর এক যুবক ব্রহ্মচারী পেটের অসুখ হওয়ায়, এক রাত্রে খেতে যাননি। গহনানন্দজী খাবারঘরে উক্ত ব্রহ্মচারীকে না দেখে তাঁর ঘরে গেলেন এবং তাঁকে না খেতে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মচারী উত্তরে বলেন, 'পেট ভাল নেই।' তখন মহারাজ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তার দেখিয়েছ?' যুবক ব্রহ্মচারী বলেন, 'তার দরকার হবে না, এক দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।' মহারাজ তখন আঙুল দিয়ে (ব্রহ্মচারীর শরীরকে) নির্দেশ করে বললেন, 'এই শরীরটা কার?' ব্রহ্মচারী উত্তর দেন, 'এটা আমার'। তখন মহারাজ দৃঢ়ভাবে তাঁকে বললেন, 'হ্যাঁ, এটা তোমার শরীর ছিল, কিন্তু যখন থেকে তুমি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেছ, তখন থেকে এই শরীরটি শ্রীরামকৃষ্ণের সম্পত্তি। একে অবহেলা বা অপব্যবহার করার তোমার অধিকার নেই।'

শিলং আশ্রমে এক নবাগত ব্রহ্মচারীকে গহনানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন, "দেখ, তুমি যখন ভক্ত হিসাবে আশ্রমে আগে আসতে, তখন আমরা একরকম ব্যবহার করতাম। কিন্তু এখন আর সেরকম ব্যবহার পাবে না। এখন তুমি আমাদের ছোট ভাই, ঘরের লোক। দরকার হলে শাসন করব, আবার ছোট ভাই-এর মতো আদরও করব। 'আসুন বসুন-খান' সেই ব্যবহার আশা করলে মনে কষ্ট পাবে। মনে রাখবে।" উক্ত ব্রহ্মচারী আশ্রমের বাগান থেকে প্রতিদিন সকালবেলা নিজের ঘরে ঠাকুরকে সাজাবেন বলে ফুল তুলে আনতেন। পূজনীয় মহারাজ তা দেখে ব্রহ্মচারীকে বললেন, 'সুগন্ধি ফুলটি ঘরে রাখলে সেই ঘরে ধ্যান বেশ ভাল জমবে, তাই তো? নিজের জন্য বাগানের ফুল তুলবে না। জানবে সব ফুলই মন্দিরের ঠাকুরের পূজার জন্য। তোমার ঘরের ঠাকুরের জন্য নয়। তাছাড়া ঠাকুর আশ্রমের বাগানে ইচ্ছামত

বেড়ান এবং উপভোগ করেন। পূজ্যপাদ রাজা মহারাজও তাই বলতেন শুনেছি। সুতরাং কথাটি মনে রাখবে। কেমন?'

একসময়ে স্বামী গহনানন্দের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও পরামর্শ জনৈক ব্রহ্মচারীর চোখ খুলে দিয়েছিল। ব্রহ্মচারী তখন আশ্রমের ভাণ্ডারী মহারাজের সহকারী হিসাবে কাজ করছিলেন। একদিন অনেক দূর থেকে একদল ভক্ত শিলং আশ্রমে আসেন। ভক্তরা তখন ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত ছিলেন। আশ্রমের ম্যানেজার স্বামী গহনানন্দজী খুব দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলেন যে, সেই ভক্তরা অনেকক্ষণ ধরে অভুক্ত অবস্থায় রয়েছেন। তিনি উক্ত ব্রহ্মচারীকে তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। ব্রহ্মচারী উত্তরে বলেন, 'মহারাজ! ভাণ্ডারী মহারাজ বাইরে গিয়েছেন। উনি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। তাঁকে না জানিয়ে কাউকে কিছু খেতে দিলে তিনি বিরক্ত হন।' তখন মহারাজ তাঁকে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'এই আশ্রম ঠাকুরের। যে ভক্তরা এসেছে, তারা তাঁরই অতিথি। তাদের দেখাশুনা করা কি আমাদের দায়িত্ব নয়? যাও, ওদের খেতে দাও। তাতে যদি ভাণ্ডারী মহারাজ অখুশী হন তো হবেন। কখনো কখনো অপরের কল্যাণের জন্য দোষভাগী হওয়াও শ্রেয়।'

এক প্রবীণ সন্ন্যাসী তাঁর শিলং জীবনের স্মৃতিচারণ করেছেন এরকম ভাবে ঃ "সুদিনে-দুর্দিনে শ্রী নরেশ মহারাজই আমার মুখ্য উপদেষ্টা ও সহায়কারী হয়ে উঠলেন। সঠিক উপদেশ দিয়ে ও অন্যান্য নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। সে ঋণ কোনদিনই শোধ করতে পারিনি—পারবও না। আশ্রম জীবনের অ-আ-ক-খ সবই তাঁর কাছে শেখা। বস্তুতঃ সাধু হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছাটি হয়েছিল তাঁরই প্রেরণায়।"

স্বামী গহনানন্দজী ১৯৫৪ সালে অন্যান্য সাধু-ভক্তদের সহযোগিতায় পুণ্য পৌষ সংক্রান্তির দিনে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালন করেছিলেন। শিলং-এর যে বাড়িতে স্বামীজী অবস্থান করেছিলেন ও কুইন্টন হলে (যে হলে স্বামীজী বক্তৃতা দিয়েছিলেন)—উভয় স্থানেই জন্মোৎসব পালিত হয়েছিল। সেই উপলক্ষ্যে যিনি সভাপতির আসল অলঙ্কৃত করেছিলেন, তাঁর স্বামীজীকে শিলং-এ অভ্যর্থনাকালে মালা পরাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই তথ্যটি তিনি তাঁর ভাষণে পরিবেশন করে সকলের মনে আনন্দ দিয়েছিলেন। তেমনি ঐ বৎসরই শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষ মহাধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছিল শিলং আশ্রমে। শেলাতেও তিনদিন ধরে এই উৎসব হয়েছিল। সেজন্য গহনানন্দজী ও আরও অনেকে চাল, আলু ইত্যাদি শিলং থেকে বহন করে নিয়ে যান। সে সময়ে স্থানীয় দেবতাদের, শিবের ও চণ্ডীমায়ের পুজো বিশেষ সমারোহে করা হয়েছিল। পরবর্তী কালে গহনানন্দজী এ ঘটনার স্মৃতি চারণ করে বলতেন, "সেখানে ঐ কদিন খুব আনন্দ হ'ল। ফিরে আসবার দিন মেয়েরা

শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় যেমন কান্নাকাটি করে থাকে, তেমন করে তারা কাঁদতে লাগল।”

স্বামী দয়ানন্দজীর প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্যে শিশু সন্তান ও মায়ের যথাযথ যত্নের আদর্শে ১৯৩২ সালে ‘শিশুমঙ্গল’ প্রতিষ্ঠান একটি ছোট টিনের চালাঘরে শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানে দয়ানন্দজীর আদর্শ বজায় রেখে, তাঁরই অধীনে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সাল অবধি নিজেকে গড়ে তোলেন স্বামী গহনানন্দজী। স্বামী বিবেকানন্দের উন্নত চিন্তাধারা ‘শিবজ্ঞানে জীব সেবা’—এই মহামন্ত্রকে আদর্শ করে মহারাজ তাঁর যাত্রা শুরু করেছিলেন, তারপর আর পিছনে ফিরে তাকাননি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৭ বৎসর কাল তিনি সেবাপ্রতিষ্ঠানের কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকেন।

তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিষ্ঠানটি ‘শিশুমঙ্গলে’র শৈশব থেকে ‘সেবাপ্রতিষ্ঠানে’র যৌবন অবস্থায় উন্নীত হয়েছিল। জীবসেবার বিভিন্ন পথ আছে। অসহায় রোগীদের চিকিৎসার সুব্যবস্থাকে সেবামূলক পথ হিসাবে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে রূপায়িত করেন। তিনি যখন ১৯৬৩-এর এপ্রিল মাসে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যভার গ্রহণ করেন তখন প্রতিষ্ঠানটির আয়তন ও পরিষেবা সীমিত ছিল। কেবলমাত্র শিশুমঙ্গল ও মাতৃমঙ্গলের কাজ নিয়ে এই হাসপাতাল চলত। তিনি এখানে একে একে মেডিসিন, সার্জারী, গাইনোকলজী, নিউরোলজী প্রভৃতি বিভাগ সার্থকভাবে গড়ে তোলেন। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন স্বামী গহনানন্দজী হাসপাতালটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করতে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার উন্নততর তাত্ত্বিক গবেষণার যোগসাধন ঘটিয়ে জ্ঞান এবং কর্মের সার্থক উৎকর্ষ বিধানের জন্য বিভিন্ন বিভাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিট খোলার এবং গবেষণামূলক কাজের ব্যবস্থা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে উন্নতমানের নার্সিং ট্রেনিং এবং বিভিন্ন ধরনের প্যারামেডিকেল কোর্সেরও তিনি প্রবর্তন করেন। তাঁরই মহৎ প্রেরণায় এই হাসপাতাল স্বল্পব্যয়ের নির্ভরযোগ্য হাসপাতাল হিসাবে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব, তিনি ডাক্তার, নার্স ও হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে আর্ত এবং পীড়িত মানুষের জন্য একটা আদর্শ সেবামূলক মনোভাব গড়ে তুলতে পেরেছিলেন।

হাসপাতালের মূল কেন্দ্র ছাড়াও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গরীব রোগীর চিকিৎসা, চক্ষু অপারেশন শিবির, গঙ্গাসাগর মেলার ত্রাণকার্য্য, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আসা অগণিত শরণার্থীদের শিবিরে চিকিৎসা ইত্যাদি বহুমুখী সেবাকার্য তিনি পরিচালনা করেন।

একজন সন্ন্যাসীর ভাষায়—“পূজ্যপাদ নরেশ মহারাজের লিডারশিপ ছিল দেখবার মত। তাঁর distribution of Labour, সবরকম জটিল পরিস্থিতি নিজের

কাঁধে নেওয়া, অধস্তনদের পিতৃসুলভ আশ্রয় দেওয়া এবং বিপদের সময় ভয়ত্রাতা হিসাবে যেকোন সাধু বা কর্মীদের ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়ানো। এঁদেরই মধ্যে যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়তেন তাঁর পাশে মহারাজ সান্ত্বনা ও সমবেদনা জানাতে নিত্য যেতেন এবং চিকিৎসকদের কাছে গিয়েও তাঁর পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর নিতেন। তাঁকে কখনো রাগতে দেখিনি। কোনদিন একটি কটু কথাও উচ্চারণ করতে শুনিনি। তাঁর মেজাজ ছিল অসম্ভব ঠাণ্ডা অথচ গভীর সংবেদনশীল। হাসপাতালের সব প্রয়োজনীয় ব্যাপার তাঁর নখদর্পণে থাকত।"

তাঁর কথাবার্তায় এবং আচার আচরণে অসাধারণ উদারতার প্রকাশ দেখা যেত। একবার সেবাপ্রতিষ্ঠানের এক কর্মীর, যার দুর্ব্যবহারে সবাই বীতশ্রদ্ধ, বিবাহের জন্য অগ্রিম অর্থের আবেদন তৎকালীন ক্যাসিয়ার নামঞ্জুর করলেও মহারাজ সেই কর্মীর আবেদন মঞ্জুর করে ধীরে ধীরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক ভঙ্গীমায় বলেন, "অফিসে যাই করুক, তাই বলে ছেলেটা কি বিয়ে করবে না?"

একবার সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে একজন সাধুর মরদেহ বেলুড় মঠে কিভাবে নিয়ে যাওয়া হবে এই নিয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানের সাধুরা যখন চিন্তিত তখন সঙ্ঘের সহ সম্পাদক ও সেবাপ্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের দ্বৈত দায়িত্বে রত মহারাজ বেলুড় মঠে রওনা হচ্ছিলেন। মহারাজ নিজের গাড়ীতে করেই মরদেহটি বেলুড় মঠে নিয়ে গেলেন। মহারাজের ওপর কাজের চাপ যত প্রবল হত ততই তিনি স্থির মনে কাজ করতেন। তাঁকে কোনদিন কর্মব্যস্ত হতে দেখা যায়নি। তাঁর কথায়, "কাজের চাপ যত বেশী হবে ততই আমি ভাল থাকি।" একবার একজন সন্ন্যাসী দুপুরে খাওয়ার পর একঘন্টা বিশ্রাম চাইলে মহারাজ বলেন, "বিশ্রাম করে করে খেলেই তো হ'ল।"

জনৈক সন্ন্যাসী পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হলে গহনানন্দজী মহারাজ, তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে এনে প্রথিতযশা Orthopaedic সার্জেনদের চিকিৎসায় সুস্থ করে তুলতে লাগলেন। যখন মোটামুটি ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে পারছেন সেই সময় তাঁর মানসিক বল ও আত্মনির্ভরতা আনবার জন্য একটু একটু করে হাল্কা কাজ দিতে লাগলেন এবং মাঝে মাঝেই তাঁর সাথে দেখা করে ফল, মিষ্টি, হরলিক্স ইত্যাদি দিয়ে যেতেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে কর্মীদের একাংশের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যায়। হাসপাতালের সামগ্রিক অবস্থা, বিশেষ করে আর্থিক সঙ্গতি চরম দুর্দশায় পড়ে। সামগ্রিক দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে অসীম ধৈর্য এবং পুরুষকারের সহায়তায় মহারাজ এই বিক্ষোভ আয়ত্তে আনেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শান্তি রক্ষা করেন। অন্যান্য সহকর্মীরা এই বিক্ষোভে বিচলিত হয়ে উঠলেও তাঁর উপদেশ ও নির্দেশে ধৈর্যহারা হননি।

ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি সকলের কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি করত। কোন নতুন কাজের ভার নেওয়ার আগে যিনি আগে দায়িত্বে ছিলেন তাঁর নির্দেশ মত কাজ শিখে নিতে হত। পদ্ধতিগত এই সুন্দর প্রথায় সাধুদের মধ্যে ঐক্য বিঘ্নিত হত না। সহসা কেউ কোন নতুন কাজে আগ বাড়িয়ে উৎসাহ দেখালে বলতেন, "দাঁড়াও, কাজ বাড়িও না।" স্বামী শঙ্করানন্দজীর কাছে সেবাকর্মে নিযুক্ত থাকাকালে এই কর্মপদ্ধতি তিনি শিখেছিলেন।

কারো কাজে কোন ত্রুটি হলে মহারাজ সবার সামনে কিছু বলতেন না—মান মর্যাদা বজায় রাখার জন্য পৃথকভাবে ডেকে বুঝিয়ে বলতেন।

সেবাপ্রতিষ্ঠানে থাকাকালে কেউ যদি মহারাজকে জিজ্ঞাসা করতেন, "মহারাজ ভাল আছেন?" তিনি বলতেন, "না, ভাল নেই"। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, "যেখানে বাড়িতে একজন অসুস্থ থাকলে বাড়ির সকলেই দুঃখিত হন, সেখানে এই বাড়িতে (হাসপাতালে), শ্রীরামকৃষ্ণ পরিবারের এতজন অসুস্থ, সেখানে আমি কেমন করে ভাল থাকব?" রোগীদের সঙ্গে এমনই ছিল তাঁর একাত্মতা।

মহারাজের ভোরবেলায় উঠে হাতমুখ ধুয়ে জপ ধ্যান করে কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যচর্চা করে উঠতে প্রায় ৮টা বেজে যেত। তারপর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত অবিরাম শুধু কাজ আর কাজ। গভীর মনোনিবেশের সাথে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতেন।

একবার বেলুড় মঠ থেকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ফিরবার সময় মহারাজের গাড়ী দারুণ জ্যামে আটকে পড়ে। হঠাৎ পেছন থেকে একজন Military Officer-এর গাড়ী মহারাজের গাড়ীতে ধাক্কা মারে। মহারাজ শান্তভাবে গাড়ী থেকে নেমে গাড়ীর পেছনের আঘাত ভাল করে জরিপ করলেন এবং পেছনের গাড়ীর নম্বর নোট করে কাঁধের চাদরটি হাতে নিয়ে Traffic Police-এর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে Traffic Control করতে লাগলেন। পথ পরিষ্কার হয়ে এলে Military Officer-কে তাঁর কৃতকর্মের অপরাধ বুঝিয়ে সরাসরি ভবানীপুর থানায় নিয়ে এলেন। শান্ত ধীর পদক্ষেপে সব কাজ সমাধা করতে দেখে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সন্ন্যাসীর মনে হয়েছিল গোটা বিশ্বই যেন নিশ্চিন্তভাবে তাঁর চলার পথ।

আর একবার সেবাপ্রতিষ্ঠানে কিছু সমাজ বিরোধী ভাঙচুর শুরু করলে মহারাজ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে একজন উত্তেজিত যুবককে হাত ধরে ঘরে নিয়ে এলেন। বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর যুবকটি নিতান্ত শান্তভাবে বেরিয়ে এল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতির মোড় ঘুরল। যারা হামলা করতে চেয়েছিল তারা চলে গেল। এই ঘটনায় মহারাজকে বিচলিত হতে দেখা গেল না বরং কিছুই যেন হয়নি এরকম শান্তভাবে সবার প্রতি গভীর মমতা মাখানো মন নিয়ে এসে চেয়ারে বসলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ নানান প্রতিকূলতার মধ্যে অবিচল, ধীর স্থির প্রসন্ন থাকেন। এর পিছনে রহস্য কি, জিজ্ঞাসিত হলে মহারাজের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর, "গীতায় পড়নি—

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।"

এটি ছিল মহারাজের অন্যতম প্রিয় শ্লোক।

একজন রোগী শারীরিক অসুস্থতায় কাহিল হয়ে পড়েছিলেন। চিকিৎসায় কোন সুরাহা সম্ভব হচ্ছিল না। মহারাজ রোগীর সাথে কয়েক মুহূর্ত কাটানোর পর রোগীর মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব তৃপ্তির হাসি দেখা গেল, তিনি অভিভূত হয়ে বললেন, "আমার জীবন আজ আনন্দে ভরে গেছে।"

মহারাজের সহানুভূতি ও ভালোবাসা অনেক চিকিৎসকেরই জীবনে আমূল পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেছেন, "আপাতকঠিন, শৃঙ্খলাপরায়ণ, মিষ্টভাষী, মিতবাক্, কর্মবীর এই মহাপুরুষ আমার জীবনদর্শন। তাঁর স্মরণে ও মননে পাই মানসিক শান্তি।"

একবার মঠ হতে আসার পথে জনৈক ব্যক্তিকে ফুটপাতে অসুখে ছট্ফট্ করতে দেখে নিজের গাড়ীতে নিয়ে এসে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করলেন। রোগী সুস্থ হলেও ডাক্তারকে নির্দেশ দিলেন ওকে তাড়াতাড়ি ছুটি না দিতে। কিছুদিন হাসপাতালে খাইয়ে দাইয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় এনে গাড়ী করে তাকে বাড়ী পৌঁছাবার ব্যবস্থা করলেন। এরকম প্রতিটি রোগীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি, যত্ন, পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর রাখা এবং রোগী আরোগ্যলাভের পর বাড়ীতে ফিরে গেলেও তাঁর সংবাদ নেওয়া— এসবের মধ্য দিয়ে শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাবটি তাঁর চরিত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

জনৈক অতিথি সন্ন্যাসী পরদিন ভোর চারটায় এয়ারপোর্ট রওনা হবেন জেনে মহারাজ, তাঁকে যাওয়ার আগে কফি খেয়ে যেতে বলেছিলেন। অতিথি পরদিন ভোরে ভাবছেন চুপি চুপি অন্ধকারে চলে যাবেন, মহারাজকে বিরক্ত করবেন না। কিন্তু মহারাজ ঐ ভোরেই তাঁকে কফি খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে সেই সন্ন্যাসী কফির দরকার নেই জানালেন। তিনি নিজস্ব মালপত্র আনতে উপরে গেলেন এবং ফিরে এসে দেখলেন মহারাজ স্বয়ং কফির কাপটি হাতে নিয়ে স্মিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

যেসব সন্ন্যাসী কোথাও মানিয়ে নিতে পারতেন না তাঁদের তিনি নিজের কাছে রেখে দিতেন, ভুল শোধরাবার সময় দিতেন। গড়ে-পিটে তাঁদের কাজের উপযোগী করে নিতেন। একজন ব্রহ্মচারীর ব্যবহারে সকলেই অখুশী ছিলেন। সব জেনেই মহারাজ তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে Construction-এর কাজে নিযুক্ত করেছিলেন যাতে

সে শোধরাতে পারে। কেউ আপত্তি জানালে বলেছিলেন, "ওর অনেক গোলমাল আছে জানি, তবু চেষ্টা করা তো যেতে পারে। তারপর ঠাকুর তাকে রাখলে রাখবেন, সরালে সরাবেন। আমরা সরাবার কে? তাকে সাধুজীবন যাপনে সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর ঐ Construction-এর কাজে কি এমন ক্ষতি হবে? যদি হয়ও, আমার কাছে এরকম এক ডজন সেবাপ্রতিষ্ঠানের চেয়ে একজন সাধুর জীবন অনেক বেশী মূল্যবান।"

প্রবীণ সন্ন্যাসীদের প্রতি মহারাজের ছিল গভীর আনুগত্য। পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী, নির্বাণানন্দজী, বীরেশ্বরানন্দজীর সুচিকিৎসার জন্য যারপরনাই পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। কখনো কখনো এঁদের চিকিৎসার জন্য বেলুড় মঠে তাঁদের শয়নঘরেই মিনি-হাসপাতাল তৈরী করে নিয়েছেন। প্রয়োজনমতো ডাক্তারবাবুদের বেলুড় মঠে পাঠানোর ব্যবস্থা তো করতেনই, এমনকি টেকনিশিয়ান, ফিজিওথেরা-পিস্টদেরও সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেলুড় মঠে পাঠিয়েছেন। এই ব্যবস্থা কোন কোন সময়ে বহুদিন ধরেই তাঁকে করতে হয়েছিল।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের এক সেবককে মহারাজ পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর সেবার জন্য বেলুড় মঠে পাঠিয়েছিলেন। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তখন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন। সেবক প্রতিদিন সেবাপ্রতিষ্ঠান থেকে বেলুড় মঠে যাতায়াত করতেন। গহনানন্দজী মহারাজ প্রতিদিন এই কর্মীকে খাওয়া-দাওয়া ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। সময়টা তখন ছিল শীতকাল। একদিন এই কর্মীকে দুটো কম্বল দিয়ে মহারাজ বলেন, 'একটা মেঝেতে পাতবি ও আর একটা গায়ে চাপা দিবি। ঠাণ্ডা লেগে শরীর খারাপ করলে মহারাজের (বীরেশ্বরানন্দজী) সেবা করবি কি করে?' একদিনের ঘটনা—এই সেবক কর্মী এক দুপুরে গাড়ী করে বেলুড় মঠ থেকে কলকাতায় ফিরছেন। গাড়ির পেছনের সিটে গহনানন্দজী বসে কাগজপত্র দেখছেন। সামনের সিটে বসে কর্মীটির একটু তন্দ্রাভাব এসেছে, বারে বারে ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ছিলেন। মহারাজ সব লক্ষ্য করছিলেন। কিছুক্ষণ পরে ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলে সেবক কর্মীটিকে পিছনের সিটে নিজের পাশে বসে বিশ্রাম নিতে বললেন। বলা বাহুল্য, মহারাজের এই মহানুভবতা সেই কর্মীকে সেদিন অভিভূত করেছিল।

একজন রোগীর এ্যাডমিশন কার্ডে মহারাজ All Free লিখে দিয়েছেন। দীর্ঘদিন সেই রোগীর চিকিৎসা চলায় বিল একলাখ টাকা ছাড়িয়ে গেলে ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে মহারাজ বললেন, "সেবা করাই আমাদের লক্ষ্য, সন্ন্যাসী হয়ে যা লিখে দিয়েছি তার অন্যথা হবে না।"

সেবাপ্রতিষ্ঠানে ৩৫লক্ষ টাকা ঘাটতি হওয়ায় কয়েকজন সন্ন্যাসী এ বিষয়ে মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে মহারাজ বললেন, "কেন, তোমাদের কি ঘুম হচ্ছে না? মন দিয়ে সেবা কর, সব ঠিক হয়ে যাবে।" কিছুদিন বাদে আবেদন বেরুল, সমস্যারও সমাধান হল। পরবর্তী কালে সেবাপ্রতিষ্ঠানের যে কোনও দুরূহ সমস্যার বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক পূজনীয় মহারাজের নিকট পরামর্শ চাইতে এলে মহারাজ একটি কথাই বারবার বলতেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে প্রার্থনা কর ও তাঁর উপর নির্ভর কর। সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।"

একজন বয়স্কা বিধবা মহিলাকে চোখ অপারেশনের জন্য তাঁর মেয়ে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্ত্তি করলে বৃদ্ধার ছেলে কোন সংগত কারণ ছাড়াই এতে আপত্তি জানায়। এমতাবস্থায় ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা অপারেশন না করিয়ে ছুটি দিয়ে দেওয়াই সংগত মনে করেন। কিন্তু বৃদ্ধার চোখের কষ্টটি থেকেই যাবে ভেবে মহারাজ বৃদ্ধার নিকট-আত্মীয়দের ডেকে ছেলেকে বোঝাতে বলেন। ছেলেটি রাজি হলে বৃদ্ধা অপারেশন করিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ফিরে যান।

সেবাপ্রতিষ্ঠানের ১৮ জন কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার অভিযোগে চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার প্রায় ৩ মাস পর যে আইনজীবী এ কাজে সাহায্য করেছিলেন তাঁকে ডেকে মহারাজ বললেন, "যে ১৮ জনকে কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাদের আবার কাজে নিতে হবে। তুমি যা ব্যবস্থা নেবার নাও।" তিনি অবাক হয়ে বললেন, "মহারাজ, বলেন কি? যাঁরা প্রতিষ্ঠানের এত ক্ষতি করেছেন, যাঁদের আমরা এত কষ্ট করে আইনগতভাবে বরখাস্ত করতে পেরেছি, তাঁদের আবার কিভাবে কাজে নেবেন?" মহারাজ ধীর, দৃঢ় ও গম্ভীরভাবে বললেন, "কিন্তু ওদের বাড়ীর ছেলে মেয়েরা খাবে কি ভেবেছ?" সেই আইনজীবী আর কোন কথা বলতে পারেননি। শুধু বসে বসে ভেবেছেন মহারাজের হৃদয়বত্তা, মহানুভবতা, উদারতা ও ভালবাসা সম্বন্ধে। অবাক হয়েছেন, বিস্মিত হয়েছেন। এরপর ঐ ১৮ জন কর্মীকে প্রতিষ্ঠানের কাজে পুনর্বহাল করা হয়।

পরবর্তী কালে পূজনীয় মহারাজ জনৈক সন্ন্যাসীকে বলেছিলেন, "কর্মই শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা—এই দুই সাধনই আমি সারাজীবন করে এসেছি।"

সেবাপ্রতিষ্ঠানে গুরুতর দায়িত্ব পালনের সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬৫ সালে গহনানন্দজী রামকৃষ্ণ মঠের অছি পরিষদের ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালক সমিতির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হন। স্বামী গহনানন্দজী মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হন ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং এই পদের দায়িত্ব বহন করেছেন ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ

পর্যন্ত। তারপর তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সারাদিন সঙ্ঘের বিভিন্ন ধরনের কাজ তিনি অম্লান বদনে দক্ষতার সঙ্গে করে যেতেন। কোনদিন উকিল ব্যারিস্টারদের সঙ্গে কাজকর্ম সেরেও সন্ধ্যায় বেলুড় মঠের আরতিতে স্থির হয়ে বসতেন। ঘরে এসে জামাকাপড় বদলে খড়ম পড়ে সব মন্দিরে প্রণাম সেরে প্রেসিডেন্ট মহারাজের সামনে এসে দাঁড়াতেন। নিজের ঘরে ফিরে আসতে যতই রাত হোক, স্নান সেরে জপ-ধ্যান করে তবে খাওয়া-দাওয়া করতেন। তিনি বলতেন, "দেরী হলেও স্নানাহার যেমন বাদ পড়ে না, তেমনি এই চিন্তাটি (ইষ্টচিন্তা)-ও বাদ দেওয়া চলে না।" সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন এক Balanced Character-এর মানুষ।

সময়ানুবর্তিতা প্রসঙ্গে মহারাজ বলতেন, "আমি সময়ের পিছনে ছুটবো না। সময় আমাকে অনুসরণ করুক।" নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দূরপাল্লার ট্রেন ধরা কিংবা প্লেনে কোথাও যাওয়ার ব্যাপার থাকলে মহারাজকে কোনদিন উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়নি। বরং অন্যান্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও মহারাজ ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলেছেন। এমনও দেখা গেছে যে Flight ধরার আগে ডানহাতে ফাইলে সই করেছেন, বাঁহাতে চামচ নেড়ে খাচ্ছেন। একবার গৌহাটি যাওয়ার Flight ধরতে এবরো খেবরো শর্টকাট রাস্তায় মহারাজকে দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেওয়া হল। ইতিমধ্যে দু'বার শরীরে অপারেশন হয়েছে। রাস্তার ধকল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করাতে স্মিত হেসে বললেন, "রাখ তোমার শরীর! আগে কাজটা সেরে নিই।" এই নশ্বর শরীর নিয়ে অত ভাবনার সময় নেই—মনোভাবটি এইরকম।

পূজনীয় মহারাজ সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও ফিটফাট থাকতে ভালবাসতেন এবং সকলেই যেন সেটি অনুসরণ করে তা চাইতেন। নিজের জামার সবগুলি বোতাম লাগাতেন ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরাও তাই করুক—এই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

মহারাজ তাঁর শারীরিক রোগ-ব্যাধির কষ্ট কাউকেই জানতে দিতেন না। সব নীরবে সহ্য করতেন। প্রোস্টেট গ্ল্যাণ্ডের পীড়া, মেরুদণ্ডের হাড়ের Slip disk, bypass surgery—সব ক্ষেত্রেই তাঁর সহ্যের ক্ষমতা দেখে চিকিৎসকরা বিস্ময় প্রকাশ করতেন।

মহারাজ সর্বদাই জপ করতেন ও অন্যদেরও তাই করতে উপদেশ দিতেন। ট্রেনে বাসে, বিমানে, এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে যখনই সময় পেতেন জপ করতেন। সংবাদপত্র বা ম্যাগাজিন পড়ে সময় ব্যয় করতেন না। একবার মহারাজ ও অপর এক প্রবীণ সন্ন্যাসী গাড়ীতে ত্রিবান্দ্রম থেকে কন্যাকুমারী যাচ্ছিলেন। রাস্তায় গাড়ীর ব্রেক-ফেল করলে দুর্ঘটনা অবশ্যম্ভাবী জেনে দুজনেই দুই দরজা দিয়ে বাইরে ঝাঁপ

দিলেন। সেই মুহূর্তেও মহারাজের মুখ থেকে শোনা গিয়েছিল 'জয় রামকৃষ্ণ'—এমনই জপসিদ্ধ ছিলেন তিনি।

এক প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী গহনানন্দজীর সম্বন্ধে বলেন, "গহনানন্দজীর মধ্যে আমি তিনটি বিষয় লক্ষ্য করেছি। (১) তিনি সমগ্র জীবন সঙ্ঘের কাজ হাসিমুখে করে গেছেন, (২) মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন ও (৩) সর্বদা নাম-জপ করতেন।"

১৯৯১ সালের জুলাই মাসে ইংলণ্ডে যান সেখানকার কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী ভব্যানন্দজীর আমন্ত্রণে। সেখানে ইউরোপের রামকৃষ্ণ মিশনের সকল বেদান্ত কেন্দ্রগুলির অধ্যক্ষদের একটি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি লণ্ডন, মস্কো প্রভৃতি ইউরোপের কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেন।

মহারাজ বলতেন, "মিষ্টি কথায় জগৎ জয় করা যায়।" ধৈর্য এবং তিতিক্ষা তাঁর চরিত্রের বিশেষ গুণ। এক অবিচল আত্মবিশ্বাসের উপর গড়ে উঠেছিল তাঁর সন্ন্যাস জীবন। কোন কথা রেখে ঢেকে অস্পষ্টভাবে তাঁকে বলার উপায় ছিল না। স্পষ্ট কথা খোলাখুলিভাবে উপস্থাপন করা তিনি বেশী পছন্দ করতেন। তাঁর গভীর ব্যক্তিত্বের সামনে কেউ অপ্রয়োজনীয় বা অসংলগ্ন কথা উত্থাপন করতে পারতেন না।

প্রশাসনিক দিক থেকে মহারাজ হয়তো সবসময় সবাইকে সব ব্যাপারে সম্মতি দিতে পারেননি। কিন্তু তাঁর সহৃদয় স্নেহমাখা ভালবাসা থেকে কেউ কখনো বঞ্চিত হয়নি। এই আপাত কঠিন এবং অন্তরের কোমল সদাজাগ্রত ভাবটি তাঁর স্বভাবগত চরিত্রের মাধুর্য্য।

'সারদা সংঘের' স্বনির্ভর প্রকল্পের কাজে মহারাজের অশেষ তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। মেয়েরা কাজ শিখবে, নিজেদের রুজি-রোজগার নিজেরা করবে—এই কথা ভেবে তিনি আত্মপ্রত্যয়ের এই কর্মযজ্ঞে অনেককে সাহায্য করেছেন। তেমনি কোলকাতা 'শ্রীসারদা আশ্রম'-এর প্রতিও তাঁর উৎসাহ ও সহায়তার কথা স্মরণীয়।

পুরুলিয়ায় মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়ে কর্মী বিক্ষোভের সময় কয়েকজনকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের সাময়িক অর্থনৈতিক বিপন্নতা মহারাজকে মর্মাহত করেছিল। তিনি মন্দিরে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নত মস্তকে ক্ষমা চেয়েছিলেন। প্রার্থনা করেছিলেন, পথভ্রষ্ট এই কর্মীরা যেন অভাবের মধ্যে না পড়েন। তাদের চলার পথ যেন সঠিক থাকে।

আশ্রমের কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি মহারাজের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি বলতেন, "আমরা বাইরে নানা সেবাকাজ করি, অথচ যারা আশ্রমের দিনরাত সেবা করছে তাদের জন্য কি আমরা কিছু ভাববো না?"

১৯৮০ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তাদের অন্যতম স্বামী গহনানন্দ। তিনি মহাসম্মেলনের প্রধান কমিটির ২জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি এই মহাসম্মেলনকে সার্থকরূপ দিতে প্রচুর পরিশ্রম করেছিলেন।

আশ্রমের জমি-সংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সেবাধর্মের বিস্তৃতি সেবাধর্মের স্বরূপেই নিহিত। নতুন জমির অধিগ্রহণ, জমি কেনা বা দানে পাওয়া বাড়ি বা জমি গ্রহণের বিষয়ে স্বামী গহনানন্দ ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও আইন-কানুনের ব্যাপারটিও তিনি ভাল বুঝতেন। বিভিন্ন আশ্রমের সংকটকালীন মুহূর্তে মহারাজ আইনগত সমস্যায় সাহায্য করতে তৎপর ছিলেন। সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটি নিয়ে তিনি অসীম দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন।

কোলকাতায় স্বামীজীর বাড়ির অধিগ্রহণের জন্য তোড়জোড় শুরু হয়েছিল স্বামীজীর শতবার্ষিকী (১৯৬৩) থেকে। তখন থেকে গহনানন্দজী এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে বেলুড় মঠের উত্তর ও দক্ষিণে মঠের জমি বিস্তৃতির জন্য তাঁর উদ্যোগ ও চেষ্টা স্মরণীয়। আরও অনেক জায়গায় জমি-অধিগ্রহণের পশ্চাতে তাঁর অবদান অপরিমেয়।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহুবিধ কর্মযজ্ঞের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অনেক কমিটি সাব-কমিটি তৈরী হয়ে থাকে। প্রায় সব কমিটির সঙ্গে কর্তৃপক্ষ স্বামী গহনানন্দকে যুক্ত রাখতেন। গহনানন্দজী সকল বিষয়ে দক্ষতার সঙ্গে পরামর্শ দিতেন ও আলোচনায় সময়ও দিতেন।

আজ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাব-প্রচার পরিষদ শ্রীরামকৃষ্ণ/শ্রীমা/স্বামী বিবেকানন্দ আশ্রম নামে পরিচিত বৃহৎ সংখ্যক নন্-অ্যাফিলিয়েটেড কেন্দ্রগুলির প্রধানত গৃহস্থ ভক্তদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে বিশিষ্ট স্থান করে নিতে অগ্রসর হচ্ছে। এর মূলে ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দশম অধ্যক্ষ পূজনীয় স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের অনুপ্রেরণা। কিন্তু এই আন্দোলনকে সঙ্ঘ থেকে যে কয়জন বাস্তব রূপ দান করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বামী গহনানন্দজী। তিনি সাক্ষাৎভাবে ডিসেম্বর ১৯৮৩-তে ২২টি আশ্রম নিয়ে রামকৃষ্ণ মঠের মালদা আশ্রমে অন্য সাধুদের সঙ্গে নিজে উপস্থিত থেকে 'উত্তরাঞ্চল পরিষদ' গঠন করেন। একইভাবে ১০-৪-৮৪-তে পাণ্ডু আশ্রমে ১৩টি আশ্রম নিয়ে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চল পরিষদ', ১৫ই আগস্ট ১৯৮৪-তে আঁটপুরে (তখন প্রাইভেট আশ্রম) ১৫টি আশ্রম নিয়ে 'হুগলী জেলা পরিষদ', ১১ই ফেব্রুয়ারী

১৯৯০-এ ২১টি আশ্রম নিয়ে 'উত্তর ২৪-পরগণা পরিষদ' গঠনে সাক্ষাৎভাবে নেতৃত্ব দেন।

'ভাবপ্রচার পরিষদে' অন্তর্ভুক্তির জন্য তিনি দশবিধ বিধি উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগে কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন। স্থানীয় মানুষদের জন্য সেবা প্রকল্প ও যথাযথ হিসাব রক্ষা (Audited Account) দশবিধ বিধির দুটি প্রধান শর্ত।

আসামে এক প্রাইভেট আশ্রম সাংগঠনিকদের মধ্যে মত-পার্থক্যে বন্ধ হয়ে যায়। গহনানন্দজী একথা জানতে পেরে, আশ্রমের পরিচালকদের পৃথক পৃথক ভাবে টেলিফোনে যোগাযোগ করে সকলকে একসঙ্গে যুক্ত হয়ে ঠাকুরের আশ্রম খুলতে পরামর্শ দেন। তার জন্যে তিনি অসংখ্য বার তাঁদের ফোন করেন। অপরিসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন। তার ফলে সেই বন্ধ আশ্রম পুনরায় খুলেছে। তিনি সেই আশ্রমে গিয়েছেন, নবনির্মিত প্রার্থনাগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি স্থাপন করেছেন, এমনকি কয়েক দিন অবস্থান করে বহু ভক্তকে দীক্ষাও দিয়েছেন।

তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত দুর্গম গ্রামের আশ্রমে গেছেন এবং খুব কষ্ট স্বীকার করে সেখানে দীক্ষাও দিয়েছেন। শুলকুনি সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত গ্রাম, তখন কোন বৈদ্যুতিক আলো বা পাখা ছিল না। প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা ও শৌচাদির জন্য ছিলনা কোন নির্দিষ্ট পায়খানা। সেই দ্বীপে যেতে হলে একটা অংশ কাদার মধ্যে দিয়ে যেতে হত। চারজন ভক্ত পূজনীয় মহারাজকে কাঁধে হাতে বহন করে, সেই কর্দমাক্ত পথটি পার করিয়ে দেন। ঐ আশ্রমে পৌঁছে পূজনীয় মহারাজ দীক্ষা দিয়ে সেখানে রাত্রি বাসও করেন এবং ভক্তদের কৃপা করেন।

মানবতার জাগরণে স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি ব্যবহার করে মহারাজ বক্তৃতা করতেন। স্বামীজীর লেখা 'নাহি সূর্য্য নাহি জ্যোতি' গানটি খুব পছন্দ করতেন। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের আশ্রমগুলিতে, ছাত্রদের মধ্যে সাধারণ কথাবার্তায় কিংবা দীক্ষার সময় স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা, আত্মমুক্তি এবং জগৎকল্যাণের কথা এমনভাবে বলতেন যে তারা সেই ভাবধারায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠত। তাঁর বাচনভঙ্গি ও চৈতন্য শক্তির প্রভাবে তা মানুষের অন্তরে গেঁথে যেত। তিনি বলতেন, "ক্ষুধার সময় খাবার ইচ্ছা, তৃষ্ণা পেলে জলপানের ইচ্ছা, বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে বাতাস পাবার বলবতী ইচ্ছা যেমন দরকার, ঈশ্বর লাভের জন্য সেরকম বলবতী ইচ্ছা ভীষণ দরকার। আর চাই তাঁকে পাওয়ার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্য অভ্যাস।"

একসময় বেলুড় মঠের সন্নিকটে অবস্থিত মিশনের 'বিদ্যামন্দির' কলেজের ছাত্ররা হাওড়া জেলার পশ্চিম মাণিকপুর গ্রামে NSS (জাতীয় সেবা প্রকল্প)-এর

শিবির করেছিল। শিবিরের মাধ্যমে তারা স্থানীয় দরিদ্র মানুষদের মধ্যে কিছু সেবামূলক কাজ করেছিল। তারা পূজনীয় গহনানন্দজীকে ঐ শিবিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। মহারাজ তখন 'সেবাপ্রতিষ্ঠানে'র দায়িত্বে ছিলেন। শিবিরের জায়গাটি একটু দুর্গম স্থানে। রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং হয়ে রেললাইন বরাবর হেঁটে শিবিরে যেতে হত। পূজনীয় মহারাজ মোটর গাড়ি করে যথা সময়ে লেভেল ক্রসিং-এ উপস্থিত হলেন। সঙ্গী সাধুদের মনে, মহারাজের পক্ষে বৃদ্ধ শরীরে রেললাইন বরাবর হাঁটার সামর্থ্যের বিষয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু পূজনীয় মহারাজ সাধুদের অবাক করে দিলেন। সাধুরা দেখলেন—মহারাজ দিব্যি রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন, কখনো বা নীচে নেমে কাঠের তক্তার উপর দিয়ে অনায়াসে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর মধ্যে বৃদ্ধ বয়সেও যুবকদের ন্যায় একটা Sportsmanship spirit ছিল।

মহারাজ যখনই সুযোগ পেতেন ছাত্রদের নানাভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করতেন। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে তাঁর অভিভাষণের মূল কথা হল—জীবনে সেবা, স্বাধ্যায়, সাধন, সংযম এবং সত্য এই পঞ্চ 'স' কার খুব নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা দরকার।

স্বামী গহনানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্যতম সহাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত হলেন ১৯৯২ সালে এবং কাঁকুড়গাছিস্থিত যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এই দ্বৈত দায়িত্বে থেকে তিনি সুদীর্ঘ ১৩ বছর অগণিত ভক্ত নরনারীর আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা মিটিয়েছেন। তার জন্য যে কী কঠোর পরিশ্রম করেছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

যোগোদ্যান মঠের সঙ্গে অনেক বৎসর ধরে তাঁর সম্বন্ধ ছিল। ১৯৪৩ সালে যোগোদ্যান মঠ রামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই সময়েই পূজনীয় মহারাজ যোগোদ্যান মঠ প্রথম দর্শন করেন।

গহনানন্দজীর দৃঢ় ধারণা ছিল, সন্ন্যাসের অর্থ সর্ব নরনারীর জন্য সেবা ও সর্বস্ব ত্যাগ। তাই কোন অল্প বয়সী যুবক-যুবতীদের সাধু হওয়ার ইচ্ছা দেখলে তাদের প্রচণ্ডভাবে ত্যাগের জীবনের প্রতি উৎসাহ দিতেন। যখন এইরকম এক যুবক একদিন এসে তার সঙ্ঘে যোগদানের ইচ্ছা ব্যক্ত করল, তখন সেই যুবকের প্রতি মহারাজের কী সহানুভূতি! সে মুহূর্তেই সেই যুবক যেন তাঁর একজন প্রিয় বন্ধু, এক পরম আত্মীয়। এমনকি পরদিন পূজনীয় মহারাজ প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সেই যুবককে অনুসন্ধান করে তাকে সঙ্গে করে হাঁটতে বেরুলেন। তখন মহারাজ তাকে প্রশ্ন করছেন, 'কোথায় যোগ দেবে?' শেষে মহারাজই যোগোদ্যান মঠের ঠিকানা দিয়ে তাকে সেখানেই

যোগ দিতে বললেন। আবার প্রশ্ন করছেন, 'কবে আসবে?' যুবক একটা সময়ের কথা উল্লেখ করে। সেই যুবক ও নির্দিষ্ট সময়ে যোগোদ্যান মঠে এসে যোগ দেয়।

তাঁকে অধিক সময়েই গুরু-গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ হিসাবে দেখা যেত এবং এইভাবেই তিনি প্রায় সকলের কাছেই পরিচিত। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল সূক্ষ্ম রসবোধ। ছোট-ছোট রসিকতা করার সুযোগ ছাড়তেন না। একজন যুবক একদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মহারাজের দর্শনার্থী হয়ে যায়। প্রণামাদির পর মহারাজ তাঁর সেবককে সেই যুবককে প্রসাদ দিতে বললেন। হাসপাতালে প্রসাদের কথা শুনে সকলের মনে কৌতুহল হল। মহারাজ তখন ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জের দিকে নির্দেশ করে বললেন—'যেখানকার যা প্রসাদ' অর্থাৎ ওষুধ আর Injection-ই হাসপাতালের প্রসাদ।

মহারাজ যখন সেবাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন, তখন সেখানকার একজন কর্মী হিসাবরক্ষক স্বভাবে একটু উগ্রপ্রকৃতির ছিল। কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলা উচিত, সেসব একেবারে বুঝতো না। তার মধ্যে ছিল প্রচণ্ড আত্মম্ভরিতা। একদিন ঐ কর্মী ক্রমাগত গোঁজামিল দিয়ে মহারাজকে খরচের হিসাবপত্র বোঝাতে চেষ্টা করছিল। এর মধ্যে একসময়ে অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বলে উঠল, 'এসব হিসাব রাখতে রাখতে আমার চুল পেকে গেল। আপনি কি বলছেন, মহারাজ?' মহারাজ শুনে মৃদু স্বরে বললেন, 'তাই নাকি! আমার চুল তো পেকে গিয়ে কবে পড়ে গেছে!' এই ধারালো বুদ্ধিদৃপ্ত ও রসসিক্ত উক্তি ঐ কর্মীর মাথায় ঢোকেনি। অগত্যা তার বাচালতায় অস্থির হয়ে দূরে একটা লাঠি দেখিয়ে মহারাজ যখন বললেন, 'দেখ, লাঠি ধরতে হবে না তো?' তখন সেই কর্মী ম্লান হাসি মুখে তার ভুল বুঝতে পারল।

স্বামী বিবেকানন্দ সনাতন ধর্মের বাণী জগৎ সমক্ষে প্রচার করেছিলেন। তার প্রথম যুগান্তকারী ঘটনা—১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে শিকাগোয় বিশ্বধর্ম মহাসভায় তাঁর ইতিহাস সৃষ্টিকারী ভাষণ। স্বামীজী সেই ধর্মমহাসভায় যোগদানের উদ্দেশে বোম্বে ত্যাগ করেন ১৮৯৩-এর ৩১শে মে। এই ঘটনার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে স্বামী গহনানন্দজীর সুদক্ষ পরিচালনায় যোগোদ্যান মঠে বিভিন্ন বক্তৃতা ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবের মাধ্যমে কোলকাতার বহু নরনারী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

এই বিশেষ ঘটনার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আরেকটি বিশ্বধর্মমহাসভা আয়োজিত হয়েছিল সেই শিকাগো শহরেই ১৯৯৩-র ২৮শে আগস্ট থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই ধর্মমহাসভায় রামকৃষ্ণ মিশনকে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়। স্বামী গহনানন্দজী রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে উক্ত মহাসভায় অংশগ্রহণ করার জন্য শিকাগোয় যান ও বিভিন্ন অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন। স্বামী বিবেকানন্দের

বাণী আজকের যুগেও কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিকই নয়, বরং বর্তমান অস্থির সামাজিক পরিবেশে তাঁর বাণী যে আরও বেশি প্রয়োজনীয় তা সেই সভায় স্বামী গহনানন্দজী প্রাঞ্জলভাবে তুলে ধরেন। তিনি ৩১শে আগস্টের ভাষণে বলেছিলেন, 'এখন সময় হয়েছে এইসব ইদানীংকালের পরিবর্তনগুলির আলোকে আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের বাণীর অধ্যয়নের এবং বর্তমান বৌদ্ধিক ও সামাজিক প্রক্রিয়াগুলিতে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করার। এখন সময় হয়েছে, আমরা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করে এক নতুন বিশ্ব, এক নতুন বিশ্বজনীন সমাজ গড়ি, যা দেশ-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রদান করবে বৌদ্ধিক আলোক, আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা, সামাজিক সমন্বয় এবং ঐক্য।'

পূজনীয় মহারাজের তত্ত্বাবধানে স্বামীজীর শিকাগো-বক্তৃতার শতবর্ষ পূর্তির সমাপ্তি উৎসব ১৯৯৪-এর ২৪-২৭ সেপ্টেম্বর যোগোদ্যান মঠে যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে অনুষ্ঠিত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর 'শিক্ষাক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার প্রয়োগ' বিষয়ে শিক্ষকদের এবং ২৬শে সেপ্টেম্বর 'যুবসমাজের আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পূজনীয় মহারাজ যোগোদ্যানে যাওয়ার পর দেখলেন, সেখানে বড় বড় খাবার ঘরগুলি বছরের মাত্র কয়েকটি উৎসবের দিনেই ব্যবহৃত হয়। তিনি তখন মঠের পাশে দরিদ্র বস্তির ছেলেদের, যারা পড়াশুনোর জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ পায় না, তাদের সকাল-বিকাল ঐ খাবার ঘরগুলিতে বসে পড়াশুনা করার সুযোগ করে দিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাদের ফ্রি কোচিং-এর ব্যবস্থা ও সকাল-বিকাল জলযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। এইভাবে মহারাজের অনুপ্রেরণায় যোগোদ্যান মঠে 'বালক সঙ্ঘে'র সৃষ্টি হয়েছিল। মহারাজের প্রেরণায় ১৯৯৫-এর ১২ ও ১৩ আগস্ট ছাত্র ও শিক্ষকদের বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে তাঁর গৃহী ও ত্যাগিশিষ্যগণ ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের এই যোগোদ্যানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্থি স্থাপন করে নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে ক্ষুদ্র মন্দিরও হয়েছিল। কিন্তু জমি নিচু হওয়ায় বর্ষাকালে চারিদিক থেকে নোংরা জল প্রায় প্রতিবছরই মন্দিরে প্রবেশ করত। তার প্রতিবিধানকল্পে স্বামী ভূতেশানন্দজী মন্দিরচত্বরের দেওয়ালটি উঁচু করেন। সেই কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন স্বামী গহনানন্দজী।

১৮৯৭ সালে স্বামীজী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সময় কোলকাতায় তাঁকে ঠিক যেমন যেমন ভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল, ১৯৯৭ সালে স্বামীজীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে তেমন তেমন ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতীয়

রেল কর্তৃপক্ষ আয়োজিত বিশেষ ট্রেনে বজবজ থেকে স্বামীজীর প্রতিকৃতি মহারাজ স্বয়ং নিয়ে আসেন শিয়ালদহ স্টেশনে।

২০০৪ সালের ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবর্ষ জন্মপূর্তি উৎসব বিশ্বের বহুস্থানে মহাধুমধামের সহিত পালিত হয়। যোগোদ্যান মঠেও স্বামী গহনানন্দজীর তত্ত্বাবধানে বিশেষ অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়েছিল।

সহ্য গুণ বড় গুণ। যোগোদ্যান মঠের একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী আশ্রমে নবাগত একজন তরুণ সন্ন্যাসীর আচার আচরণে বিরক্ত হয়ে গহনানন্দজী মহারাজের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করলে মহারাজ গম্ভীর হয়ে ধীরে ধীরে বলেন, 'আমাকে সবরকম ফুল দিয়েই তো ডালি সাজাতে হবে।'

স্বামী গহনানন্দজী সদা সেবাপরায়ণ ছিলেন। সেবাকর্ম থেকে বিরত হয়ে কোন তীর্থদর্শনের স্পৃহা তাঁর মনে জাগত না। কারণ, নিত্য কর্মস্থলই হল তাঁর কাছে নিত্য তীর্থ। তথাপি পরিণত বয়সে অন্য সাধুদের সঙ্গে তিনি কয়েকটি মাত্র তীর্থস্থানেই গিয়েছিলেন। ১৯৯৭-এ গঙ্গোত্রী ও বদ্রীনাথ দর্শন করেন এবং ২০০২-তে শিবতীর্থ অমরনাথ দর্শন করেন।

এই বছরেই মহারাজ গয়াধামে গমন করেন। সেখানে তিনি শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করেন ও পূজা দেন। সেখানে এক ভক্তগৃহে অবস্থান করে স্বল্প সংখ্যক ভক্তকে দীক্ষাদান করেছিলেন। পূজনীয় মহারাজ সেখানে বলেছিলেন, 'গয়ার গদাধর থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের উৎপত্তি। কাজেই এই গয়াতে একটি রামকৃষ্ণ কেন্দ্র হওয়া দরকার।'

১৯৯৯-এর মার্চ মাসে দিল্লীর AIIMS হাসপাতালে পূজনীয় মহারাজের বাইপাস সার্জারী হয়।

২০০৪ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর কোলকাতার স্বামীজীর পৈতৃক বাড়ীর উদ্বোধন করেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। ঐ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গহনানন্দজী অংশগ্রহণ করেন ও বক্তব্য রাখেন। তিনি পরবর্তী বছরের প্রথম সপ্তাহে বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উৎসবেও যোগদান করেন। উদ্বোধনী অধিবেশনে পূজনীয় মহারাজ একটি ভাষণ দেন।

যোগোদ্যানের শান্ত ও নির্জন পরিবেশ বজায় রাখা পূজনীয় মহারাজের চিন্তার কারণ ছিল। সেজন্য তিনি বহু চেষ্টা করে মঠের পাশে অবস্থিত ২/৩টি বাড়ী কিনে নেন। এরপর ১৫ বছর বন্ধ থাকা হিন্দুস্থান লিভারের জমি তিনি প্রায় দু'কোটি টাকা দিয়ে কেনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

যোগোদ্যানে পূজ্যপাদ মহারাজ স্নানাদি সেরে নিত্য মন্দির-দর্শনে যেতেন। মন্দির থেকে ফিরে এলে আশ্রমের সাধুরা তাঁকে প্রণাম করার জন্য তাঁর ঘরে সমবেত

হতেন। তারপর ভক্তবৃন্দের প্রণামের পালা। বিষ্ণু নামের জনৈক সাধুর নানা কারণে প্রায়ই প্রণামে আসতে দেরী হত। একদিন সকলের প্রণাম করা হয়ে গেছে। মহারাজ অপেক্ষা করছেন সেই সাধুটির জন্য। উপস্থিত সাধুরা সকলেই বিরক্ত। হঠাৎ সেই সাধুর দ্রুত আবির্ভাব। মহারাজ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'কি হে, আমরা যে এতক্ষণ বিষ্ণু-হীন যজ্ঞ করছিলাম।' সকলে হেসে উঠলেন।

একদিন ভক্তদের প্রণামের সময় জনৈক ভক্ত আবদার করলেন যাতে তাঁর মাথায় পূজ্যপাদ মহারাজ হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেন। এই দেখাদেখি উপস্থিত আরও কিছু ভক্ত উৎসাহিত হয়ে একে একে মহারাজের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। পূজ্যপাদ মহারাজ বলে উঠলেন, 'এ যে দেখছি ছোঁয়াচে রোগ!' তারপর ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'যে যত তাড়াতাড়ি প্রণাম করবে, তার তত বেশী পুণ্য।' এই মন্তব্যে বেশ কাজ হল।

পূজ্যপাদ মহারাজের মুখে মঠের প্রাচীন সাধুদের কিছু স্মৃতিচারণ শুনবার ইচ্ছা নবাগত ব্রহ্মচারীদের মনে জেগেছে। তাদের মধ্যে একজন মহারাজকে আবদার করে বলল, 'মহারাজ, আমরা আপনার কাছে কিছু কথা শুনতে চাই।' মহারাজ সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'বেশ, কথা শুনিয়ে দেব।' উপস্থিত সকলে উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ সফরে বেরুবেন। সকলেই প্রস্তুত। গাড়ী ঘরের সামনে অপেক্ষা করছে। হাতে আর বেশী সময় নেই। সেবক মহারাজকে বললেন, 'মহারাজ, সব মাল গাড়িতে উঠে গেছে।' মহারাজের স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর (নিজেকে দেখিয়ে), 'আরে, আসল মালই তো পড়ে রইল!'

মহারাজের চরিত্রে তিতিক্ষা ছিল, কিন্তু তা বলে রঙ্গ-রসের অভাব ছিলনা। একদিন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সারাদিন কাজের পরে রাত দশটা নাগাদ সাধুরা খাবার টেবিলে বসেছেন। সাধুরা পরস্পর পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। কারণ, কারও কারও পাতে তরকারির সঙ্গে আরশোলার টুকরো পড়ে আছে। গহনানন্দ মহারাজের পাতে আরশোলার মাথাটি পড়েছে। তিনি সেটি চামচ দিয়ে সরিয়ে রেখে চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছেন। অন্য সাধুদের অবস্থা দেখে মহারাজ তাঁদের বলছেন, 'এর ধড়টি কোথায় গেল?'—নির্বিকার চিত্তের কেমন সংক্ষিপ্ত অথচ রসসিক্ত উক্তি!

পূজনীয় মহারাজ সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ হওয়ার সাথে সাথেই ভারতের ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দীক্ষাদানের জন্য আবেদন আসতে থাকে। পূজনীয় মহারাজও সেই ডাকে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরল,

আন্দামান, অরুণাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন আশ্রমে একাধিকবার অগণিত ভক্তকে দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেন। ভারতবর্ষের বাইরে বাংলাদেশ, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, মরিশাস, ফিজি, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা, কানাডা, রেঙ্গুন, ইংল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীর বিভিন্ন স্থানেও বিভিন্ন সময়ে দীক্ষাদান করেন।

অনেক জায়গায় এক একদিনের দীক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০-২৫০ পর্যন্ত হয়ে যেত। ধৈর্য ধরে প্রত্যেক দীক্ষার্থীকে দীক্ষার সমস্ত বিষয় বুঝিয়ে দিতেন। কোন কোন সময় দীক্ষা সম্পূর্ণ হতে বিকেল বা সন্ধ্যা হয়ে যেত। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর কোন ক্লান্তিবোধ ছিল না। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলি ছাড়াও ভক্তদের পরিচালিত বহু ছোট ছোট আশ্রমে গিয়েও দীক্ষা দিয়েছেন। সব জায়গায় তাঁর অবস্থানের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও হয়ত থাকত না। কিন্তু তাতে কখনো তিনি বিরক্ত হতেন না। সেবকরা এই নিয়ে আপত্তি করলে তিনি বলতেন, "আমি যদি এখন হৃষিকেশে থাকতাম ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হতো। এখানকার ব্যবস্থা তো তার থেকে অনেক উৎকৃষ্ট।" উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের প্রতি তাঁর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। প্রতি বছরই তিনি সফরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যেতেন এবং প্রতিবারেই অসংখ্য ভক্তদের দীক্ষাদানে কৃতার্থ করতেন। অসমর্থদের দীক্ষাদান কালে অনেকসময় মন্ত্র সরল করে দিতেও তাঁকে দেখা গিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীক্ষা দিতে গেলে সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে মহারাজ বহু সময় ব্যয় করতেন। সেবকরা আপত্তি জানালে তিনি বলতেন, "এদের মধ্যে কবে আসব আবার তার কোন ঠিক নেই। তাই এদের সাথে যতটা সম্ভব সময় কাটিয়ে যাই।"

সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী ২০০৫ সালের ২৫শে এপ্রিল দেহত্যাগ করেন। তারপর মঠ-মিশন কর্তৃপক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজকে চতুর্দশ অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত করেন, ২৫শে মে ২০০৫-এ। তিনি যোগোদ্যান মঠ থেকে বেলুড় মঠে চলে আসেন ও প্রেসিডেন্ট মহারাজের বাসভবনে অবস্থান করতে শুরু করেন। এখানে তাঁকে সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হত। সপ্তাহে দু-তিন দিন দীক্ষাদান ছাড়াও তিনি নিত্য দু'বেলা অগণিত ভক্তের প্রণাম গ্রহণ ও তাদের আধ্যাত্মিক উপদেশ ও নির্দেশাদি দিতেন। প্রতিদিন সকালে মহারাজ সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রণাম গ্রহণ করতেন। মাঝে মধ্যে শরীর সুস্থ থাকলে ভারতের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শনে যেতেন।

২০০৫ সালে সঙ্ঘাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণের পরে পূজনীয় মহারাজ দক্ষিণে ব্যাঙ্গালোর ও কালাডি, উত্তর ভারতের দিল্লী, মায়াবতী ও শ্যামলাতাল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গৌহাটি, শিলং ও চেরাপুঞ্জি গিয়েছিলেন। পরের বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে

মহারাজ নাগপুর কেন্দ্রে নবনির্মিত মন্দিরের উদ্বোধন করেন। তাছাড়া আগরতলা, দেওঘর, ভুবনেশ্বর, কোলকাতায় স্বামীজীর বাড়ি প্রভৃতি স্থানে মহারাজ গিয়েছিলেন ও বহু ভক্তকে কৃপা করেছিলেন। ২০০৭-এর জানুয়ারী মাসে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব তিথিতে বেলুড় মঠে ব্রহ্মচারি-প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন।

২০০৫ সালের ২৫, ২৬, ২৭ অক্টোবরে বেলুড় মঠে ত্রৈবার্ষিক সাধুসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই উপলক্ষে পূজনীয় মহারাজ সাধুদের উদ্দেশে বলেন, 'ত্যাগ, ভগবৎপ্রেম ও সেবা—আমাদের সঙ্ঘের তিন আদর্শ। আমরা এই সুমহান ভাবাদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের নিকট হতে লাভ করেছি। আমরা কিভাবে এই মহৎ আদর্শগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করব—এরই উপর সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।'

সঙ্ঘের প্রবীণ সাধুদের প্রতি মহারাজের শ্রদ্ধা অনুকরণীয়। সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রাতঃকালীন প্রণাম-পর্ব চলছে। হঠাৎ দেখা গেল মহারাজ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। কারণ তিনি দেখতে পেয়েছেন যে তাঁর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ এক সন্ন্যাসী তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। প্রবীণ সন্ন্যাসী কাছে আসতেই মহারাজের আবদার, 'আপনি আমার মাথায় একটু হাত দিন।' প্রবীণ সাধু সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, 'তা কি হয়, তুমি আমাদের সঙ্ঘগুরু। তুমি আমার মাথায় হাত দাও।' শেষে পূজ্যপাদ মহারাজ ঐ সাধুর পাদস্পর্শ করে ক্ষান্ত হলেন।

সাধারণত সাধুদের প্রণামের সময় পূজনীয় মহারাজ বেশি কথাবার্তা বলতেন না। কিন্তু প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে যথাযথ উত্তর দিতেন। একদিনের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূজনীয় মহারাজ একটি শাখাকেন্দ্র পরিদর্শন করে বেলুড় মঠে ফিরেছেন। নিত্যকারের মতো সাধু-ব্রহ্মচারীরা পূজনীয় মহারাজকে প্রণাম নিবেদন করছেন, একে একে এগিয়ে যাচ্ছেন। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ সন্ন্যাসী পূজনীয় মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন ও উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বললেন, 'মহারাজ, আপনি অনেকদিন ছিলেন না, মঠ ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল।' মহারাজ ঐ ঘরের চতুর্দিকের দেওয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের ছবিগুলির দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, 'তাঁরা তো ছিলেন!'

সন্ন্যাসী মহারাজ ঃ কিন্তু মহারাজ, আপনি হচ্ছেন তাঁদের প্রতিনিধি।

পূজ্যপাদ মহারাজ ঃ তুমিও তো তাঁদের প্রতিনিধি।

সন্ন্যাসী মহারাজ ঃ মহারাজ, আপনি হলেন সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট। আপনি আমাদের চেয়ে অনেক এগিয়ে।

পূজ্যপাদ মহারাজ একটু সময় নিলেন ও ঐ সন্ন্যাসী মহারাজের চোখে চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বললেন, 'ঠাকুর কৃপা করে তাঁর পায়ে স্থান দিয়েছেন, এই যথেষ্ট। যাও, যাও, যাও!'

উপস্থিত অন্যান্য সাধুরা এই বার্তালাপ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান এই ভেবে যে, কতটা গভীর অনুভূতি থাকলে ঐরূপ শরণাগতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় —"ঠাকুর কৃপা করে তাঁর পায়ে স্থান দিয়েছেন, এই যথেষ্ট।"

এই সময়েই একদিন এক সেবক পূজনীয় মহারাজকে প্রশ্ন করে বসেন, 'মহারাজ! আপনি ঈশ্বর-দর্শন করেছেন?' মহারাজ সেবককে 'তা তোমার জানার কি দরকার?' বলে নিরস্ত করতে চাইলেন। সেবক নিরস্ত না হয়ে বলেন, 'মহারাজ, তা জানলে আমরা সাধন-জীবনে আরও বল, আরও বেশি উৎসাহ পাব।' মহারাজ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, একবার যখন আমি সেবাপ্রতিষ্ঠানে ছিলাম, তখন সেখান থেকে উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে গিয়ে উপরে মাকে প্রণাম করতে গিয়েছি। মায়ের পদচিহ্নের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করছিলাম। তখন দেখলাম, আমার পাশে শ্রীশ্রীমা সাক্ষাৎ দাঁড়িয়ে আছেন।' তখন সেবক পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'মা তখন আপনাকে কিছু বললেন?' মহারাজ উত্তরে বললেন, 'না, কিছু বলেননি।'

স্বামী গহনানন্দজী সঙ্ঘের অধ্যক্ষ পদে আসীন হওয়ার পর ভক্তদের প্রতি তাঁর কৃপা যেন শতধারে প্রবাহিত হচ্ছিল। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদেরও অনেক কষ্ট স্বীকার করে দীক্ষা দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের সংশোধনাগারে বন্দী মানুষদেরও তিনি দীক্ষা দিয়েছেন। পূজ্যপাদ মহারাজজী সর্বপ্রথম মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের এক বন্দীকে মহামন্ত্র দেন। এভাবে পরপর চারজনকে কৃপা করেছিলেন। এঁরা সকলেই দীক্ষা প্রাপ্তির পরে এক নতুন জীবনের সন্ধান পান। তাঁদের জীবনের পরিবর্তন লক্ষ্য করে সকলেই বিস্মিত হয়েছেন। 'The Times of India' ও অন্যান্য পত্রিকায় এঁদের এই পরিবর্তনের কথা প্রকাশিত হয়েছে।

'শ্রীসারদা মঠে'-র সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীরাও পূজনীয় মহারাজকে দর্শন ও তাঁর নিকট আধ্যাত্মিক উপদেশ লাভের জন্য প্রায়ই বেলুড় মঠে আসতেন।

স্বামী গহনানন্দের মহাজীবনের অন্তিম বর্ষের (২০০৭) প্রথম থেকেই শরীরের দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করা যায়। তার সঙ্গে তাঁর মনের অন্তর্মুখীনতার ভাবও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূজনীয় মহারাজজী এই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে পুণ্যভূমি কামারপুকুর ও জয়রামবাটী শেষবারের মতো দর্শনে যান। উভয় স্থানেই তিনি বহু মানুষকে দীক্ষাদানে পরিতৃপ্ত করেছেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর তিনি বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। বিদায়ের প্রাক্‌ক্ষণে জয়রামবাটীতে তিনি গাড়ীতে উঠবার আগে

শ্রীশ্রীমায়ের গর্ভমন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করার জন্য বারবার জেদ করতে থাকেন। সেবকরা মহারাজের শারীরিক অসুস্থতার কথা ভেবে মন্দিরে নিয়ে যেতে চাননি। কিন্তু মহারাজের তীব্র আগ্রহ দেখে বাধ্য হয়ে তাঁকে গর্ভমন্দিরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। ভেতরে প্রবেশ করে শ্রীশ্রীমায়ের পায়ে অঞ্জলি দেবার জন্য মহারাজ ফুল চাইলেন। তখন নিকটে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার মতো কোন ফুল না থাকায় অন্যান্য সাধুরা ছুটে গিয়ে পাশের বাগান থেকে কিছু ফুল এনে মহারাজের হাতে দেন। মহারাজ সেই সব ফুল শ্রীবিগ্রহের পাদদেশে অঞ্জলি দেন। তারপর যে প্রস্তরনির্মিত পদ্মটির উপরে শ্রীশ্রীমায়ের বিগ্রহ স্থাপিত সেই পদ্মটিকে মহারাজ দু'হাত দিয়ে বেষ্টন করে দীর্ঘ সময় ধরে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করলেন। মহারাজের এই দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রণাম উপস্থিত সকলকে বিস্মিত করেছিল। প্রণামের পর মহারাজ ধীরে ধীরে মন্দিরের বাইরে চলে এলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে এক প্রসন্নতার ভাব বিরাজ করছিল। এরপর গাড়ীতে উঠবার পূর্বমুহূর্তে তিনি তাঁর দুটি হাত জোড় করে ভক্তদের উদ্দেশে নমস্কার জানালেন। তাঁর অন্তিমক্ষণ আসন্ন জানতে পেরেই কি তিনি দীর্ঘক্ষণ ধরে শ্রীশ্রীমায়ের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন?

স্বামী গহনানন্দজী এই বছরের মে-জুন মাসে জামতাড়া মঠে যান। সেখানে এক মাসেরও কিছু বেশি সময় অবস্থান করেছিলেন। শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সেখানে ভক্তদের প্রণাম, দীক্ষা, সাক্ষাৎকার সবই চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে আকু-পাংচার প্রভৃতি চিকিৎসাও চলছিল। এখানে একাধিকবার মহারাজ তাঁর আসন্ন মহাসমাধির কথা ব্যক্ত করেছিলেন। একবার প্রাতঃভ্রমণের সময় তিনি বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার যেতে হবে।' সঙ্গী সেবক তখন বললেন, 'সে কি মহারাজ! আপনার শরীর তো ভাল আছে। এতো সুন্দর হাঁটছেন। আপনাকে অনেকদিন থাকতে হবে, অনেক কাজ করতে হবে।' পূজনীয় মহারাজ সেই কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন ও হাতের লাঠিটা তুলে বললেন, 'আমি যা বলছি, তা মিলিয়ে দেখে নিও।' প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে ঘরে ফিরে এসে মহারাজ আবার বললেন, 'মঠ থেকে ওদের (বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষ) ডাক। আমি ওদের বুঝিয়ে সব বলে দেব। ওরা এবার ভার নিক।' সেদিন অনেকভাবে বুঝিয়ে পূজনীয় মহারাজের মনটিকে অন্যদিকে ফেরানো হয়।

১৭ই জুন পূজনীয় মহারাজ জামতাড়া থেকে বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পরে অসুস্থতার দরুণ তাঁর শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে যাওয়া হয়নি। মহারাজ ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া করছেন না ও অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তাও কমিয়ে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় একদিন এক সেবক-মহারাজ পূজনীয় মহারাজজীকে বললেন, 'আপনি কতদিন মন্দিরে যাননি, জানেন? ওখানে ঠাকুর বসে আছেন—আর আপনি যাচ্ছেন

না—!' পূজনীয় মহারাজ, যিনি কতদিন ধরে ভালভাবে কথাই বলছেন না, তিনি একরকম হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উনি এখানেও আছেন। উনি আমায় দেখছেন।'
সেবক মহারাজ ঃ 'উনি কি দেখছেন? ওষুধ-পত্র খাচ্ছেন না, কিছু করছেন না।'
পূজনীয় মহারাজ ঃ 'উনি আমায় আসল ওষুধ দিচ্ছেন।'
সেবক-মহারাজ ঃ 'তাহলে উনি আপনাকে প্রেসিডেন্ট করে এভাবে রেখেছেন কেন?'
পূজনীয় মহারাজ ঃ 'ও তুমি বুঝবে না।'
সেবক-মহারাজ ঃ 'তাহলে কে বুঝছেন?'
পূজনীয় মহারাজ ঃ 'ও যিনি বুঝবার—তিনি বুঝছেন। তোমার সময় হোক—তখন তুমি বুঝতে পারবে।'

ক্রমে ক্রমে পুণ্য স্নানযাত্রার তিথি এল ৩০শে জুন। এই দিন মঠে অগণিত ভক্তের সমাগম হয়েছিল। পূজনীয় মহারাজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে যান ও গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের আত্মারামের কৌটার উপরে পুষ্পাঞ্জলি ও জল অর্পণ করেন। তারপর মহারাজ মন্দিরের মেঝেতেই বসতে তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বহুদিনের অভ্যাস না থাকায় মহারাজ ইচ্ছা সত্ত্বেও নিচে বসতে পারলেন না। একটি ছোট টুলের উপর বসে মহারাজ জপ করতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধরে জপ করে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করলেন ও মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডলে বিরাজ করছিল সীমাহীন প্রশান্তি।

এরপর ১৭ই জুলাই বেলুড় মঠে মহারাজ শেষ বারের মতো ভক্তদের দীক্ষা দান করেন। ১৯৯২ সালের ১৫ই জুন স্নানযাত্রার দিন যোগোদ্যান মঠে ২৫ জন ভক্তকে দিয়ে তাঁর যে দীক্ষাদান পর্ব শুরু হয়েছিল ২০০৭-এর ১৭ই জুলাই-তে ২ জন ভক্তকে দিয়ে তার সমাপ্তি হয়। পূজনীয় মহারাজের মোট দীক্ষিত ভক্তসংখ্যা ১লক্ষ ৪২ হাজার ৯৫৫। শরীর অত্যধিক খারাপ হয়ে যাওয়ায় আর দীক্ষাদানের সুযোগ হয়নি। কিন্তু এই অবস্থাতেও ২৪শে জুলাই তিনি তাঁর প্রিয় 'সেবাপ্রতিষ্ঠানে'র নব নির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠানের ৭৫ বছর পূর্তি উৎসবের সূচনা করেন। দ্বারোদ্ঘাটনের পর তাঁকে সেখানে ভর্তি করা হয় ও শরীরের সম্পূর্ণ Check up করা হয়।

এরপর, ৩০শে জুলাই ছিল গুরুপূর্ণিমা। সেদিন মহারাজ বেলুড় মঠে সারাদিন নিতান্ত শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের প্রণাম গ্রহণ করেন। ২৮শে আগস্ট ঝুলন পূর্ণিমার দিন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ মহারাজের পুণ্য জন্মতিথি উপলক্ষে পূজনীয় মহারাজ আগত ভক্ত-সন্ন্যাসীদের প্রণাম গ্রহণ করেন।

পূজনীয় মহারাজজীর শরীরের অবস্থা তখন থেকে খুবই খারাপ হতে লাগল।

Alzheimer ও অন্য বার্ধক্যজনিত রোগের ফলে তাঁর শরীরে কখনো কখনো Convulsion হচ্ছিল। তাঁর এই শারীরিক অবনতি মঠ কর্তৃপক্ষের নিকট উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। তাই ৪ঠা সেপ্টেম্বর মহারাজকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ICCU-তে ভর্তি করানো হয়। ওষুধের প্রভাবে মহারাজ তখন প্রায় সর্বদা তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকতেন। তা সত্ত্বেও ভক্তরা মহারাজের দর্শন থেকে বঞ্চিত হননি। প্রথম কিছুদিন মহারাজ কিছু কথা বলতে চাইতেন, কিন্তু তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। হঠাৎ-ই একদিন মহারাজকে পরিষ্কারভাবে বলতে শোনা গেল—'জয়গুরু', 'জয়গুরু'। এরকম প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় মহারাজ হাসপাতালে অবস্থান করছিলেন। শরীরের অবস্থা কখনো ভাল, কখনো খারাপ।

হাসপাতালের সেবিকারা পূজনীয় মহারাজকে নিরন্তর সেবা-শুশ্রূষা করেছেন। তাঁরা যে আন্তরিকতার সঙ্গে মহারাজের দিকে প্রতি মুহূর্তে দৃষ্টি দিয়েছেন, তা অতুলনীয়। ডাক্তারবাবুরা কী সুগভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মহারাজের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করেছেন ও তার জন্য তাঁদের যে উদ্বেগ, তা যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁরা তা কোনদিন ভুলতে পারবেন না। কোলকাতার বা ব্যাঙ্গালোরের খ্যাতনামা চিকিৎসকগণ, এমনকি ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞেরাও যথাসাধ্য চেষ্টা ও চিন্তা করেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

তাঁর শরীরের সঙ্কটাবস্থা সকলের নিকট উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, কিছুদিন পরই বেলুড় মঠে বিরাট শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব, তারপর, শাখাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ মহারাজদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এ সবের মধ্যে পূজনীয় মহারাজের জীবনাবসান ঘটলে উক্ত অনুষ্ঠান বা সম্মেলনের উপর ব্যাঘাত ঘটবে। কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠান ও সাধুসম্মেলন যথারীতি সুসম্পন্ন হয়ে যায়। এমনকি ৪ঠা নভেম্বর, মহাপ্রয়াণের দিনেও পূর্বাহ্নে সেবাপ্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটিনাম জুবিলী উদ্‌যাপনের অঙ্গ হিসাবে বিশেষ সাধুসেবাও যথারীতি সম্পন্ন হয়ে যায়। সাধুসেবায় আগত প্রায় ৭০ জন সাধু সকলেই দুপুরে মহারাজকে দর্শন-প্রণাম করলেন। এরপর, বিকেল ৪-৪৫ মিনিট থেকে মহারাজের শরীরের দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। চিকিৎসকগণ তৎক্ষণাৎ যথোপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করলেন। কিন্তু, শরীরে কোন উন্নতির চিহ্ন দেখা গেল না। বরং অবনতিই সকলের উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলল। চিকিৎসকগণ মহারাজের শরীরের চরম সঙ্কট উপস্থিত একথা সেবক মহারাজদের জানিয়ে দিলেন।

উপস্থিত সকলেই লক্ষ্য করলেন, মহারাজ চোখ দুটি খুললেন। তখন সেবকগণ সঙ্গে সঙ্গে বেলুড় মঠ থেকে আনীত একটু চরণামৃত মহারাজের মুখে দিলেন, মহারাজের কপালে ও বুকে ঠাকুরকে নিবেদিত নির্মাল্য স্পর্শ করালেন। তাঁর চোখের

সামনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর আলোকচিত্রত্রয় ধরা হল, মহারাজ বিস্ফারিত নয়নে তাঁদের দেখতে লাগলেন। এদিকে সকলে তখন সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র নামগান 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' গেয়ে মহারাজকে শোনাতে লাগলেন। এভাবে প্রায় ১৫ মিনিট অতিক্রান্ত হল। এরপর মহারাজ নিজেই ধীরে ধীরে চোখ দুটি মুদ্রিত করলেন। এইভাবে ৩-৪ মিনিট থাকার পর একটু জোরে দু'বার শ্বাস ত্যাগ করলেন। মনিটরে রেখাচিত্র তখন সরলরেখায় বয়ে চলেছে। দীপশিখা বিশ্বাকাশে বিলীন হ'ল। নদী-প্রবাহ সমুদ্রে মিলিত হল। যথার্থ মানব দরদী, নিরলস সেবাকর্মী, ভগবচ্চরণে নিবেদিতপ্রাণ স্বামী গহনানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণপদে চিরকালের জন্য মিলিত হলেন। তখন সময় সন্ধ্যা ৫-৩৫ মিনিট। চারদিক থেকে অন্ধকার এসে জগৎকে গ্রাস করল। বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরে সন্ধ্যারতি চলছে, সাধু-ভক্তগণ আরতি সঙ্গীত শুরু করেছেন, "খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।"

মহাসমাধির শোকবার্তা সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে তড়িৎগতিতে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সেবাপ্রতিষ্ঠানে তাঁর মরদেহ কেবিন থেকে নামিয়ে নবনির্মিত ভবনে (যে ভবনটি পূজনীয় মহারাজই মাত্র কিছুদিন আগে উদ্বোধন করেছিলেন) প্রশস্ত হলে শায়িত রাখা হয়। অসংখ্য নরনারী তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতালে আসেন। তারপর ঐ রাত্রেই পূজনীয় মহারাজজীর পূতদেহ বেলুড় মঠে এনে সংস্কৃতিভবনে রাখা হয়। রাতভর হাজার হাজার ভক্ত বেলুড় মঠে আসেন ও মহারাজের প্রতি ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন। পরদিন মধ্যাহ্নে সাধু ব্রহ্মচারীরা মহারাজজীর শরীর বহন করে নিয়ে আসেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরের সম্মুখে স্নান ঘাটে। পূজনীয় মহারাজকে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর, তাঁকে আরতি করা হয়। অগণিত ভক্তদের কণ্ঠে জয়ধ্বনি মুহুর্মুহু হতে থাকে—"জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়।" তারপর পূজনীয় মহারাজের শরীর সজ্জিত চিতায় রাখা হয় ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। তখন সময় দুপুর ১টা। পবিত্র গঙ্গাতীরে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের সমবেত কণ্ঠে ভজনগানের মধ্য দিয়ে মহারাজের পার্থিব শরীর ভস্মীভূত হল। সমাধিস্থল ফুল ও মালা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো হল। সব শেষ! সকলের মিলিত কণ্ঠে বৈদিক শান্তিমন্ত্র ও জয়ধ্বনি উচ্চারিত হল—

জয় শ্রীগুরু মহারাজজী কী জয়।
জয় মহামাঈ কী জয়।
জয় স্বামীজী মহারাজজী কী জয়।
জয় গঙ্গামাঈ কী জয়।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

উক্তি সংকলন ঃ

- শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের কেন্দ্রস্থল (central figure)। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে এটি ভুললে চলবে না। তিনি আমাদের পরিবারের কর্তা, তিনি আমাদের আশ্রমের অধিপতি। যখনই বিপদে পড়বে, সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাঁকে জানাবে, তাঁকে বলবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে।

- সবসময় মনে করবে আমি তাঁর, ঠাকুরের প্রতিনিধি। প্রতিনিধির নিজস্ব বলতে কিছু থাকে না। এই ভাব সর্বদা মনে জাগরূক থাকলে কখনো বেচালে পা পড়বে না।

- চরিত্র গঠনই আসল কথা। ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শে চরিত্র গঠন করতে হবে। চরিত্র গঠনের জন্য আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতার খুব প্রয়োজন।

- যদি আমরা পরিপূর্ণ তৃপ্তি, প্রকৃত আনন্দ বা স্থায়ী শান্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের এই নিকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র সত্তার উর্ধ্বে যেতে হবে এবং সেই উৎকৃষ্ট সত্তা যা আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, আমাদের চেতনার মূল উৎস—তাঁকে আবিষ্কার করতে হবে।

- মঠের প্রতিটি কাজ ঠাকুরকে মনে রেখে, ঠাকুরকে কেন্দ্র করে। তাই প্রতিটি কাজেই ষোল আনা মন দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যা কাজ করছি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা, ঘর মোছা, ঘর ঝাড়া বা পূজার আয়োজন করা, ফুল বেলপাতা বা দূর্বা তোলা—যে কাজই হোক না কেন পুরোপুরি মন যদি দেওয়া হয়, তাহলে সব কাজই হবে ঠাকুরসেবা বা পূজা।

- আমাদের উচিত ঠাকুরের উপর নিজেদের ভার অর্পণ করা। নিজে কি চাইতে কি চেয়ে বসব, কে জানে। ঠাকুরের উপর নির্ভরতা চাই।

- যেসব যুবক সামনে কোন আদর্শ পাচ্ছে না, ঠাকুর, স্বামীজীর আদর্শ তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ নিজ বাড়িতেও একটা আদর্শ মেনে চলে, তবে তার প্রভাবে ছেলে-মেয়েরাও সত্যকার মানুষ হয়ে উঠবে।

- আমাদের দরকার ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া। আমরা যারা ঠাকুরের এই আদর্শের সংস্পর্শে এসে পড়েছি, আমাদের লক্ষ্য হবে সকলের কল্যাণ করা।

- আজকের এই যুগসন্ধিক্ষণে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর ভাবধারাকে আশ্রয় করে সকলের তরে এগিয়ে এসে একটি যোগসূত্র রচনা করা আমাদের আশু কর্তব্য ; যে যোগসূত্রের মুলমন্ত্রটি হবে 'নিঃস্বার্থ-ভালবাসা'।